এলীয়া

প্রকাশক
শেখ মাহবুবেল হক

[মূল বইটি ইব্রানী ভাষায় লিখিত। পর্যায়ক্রমে ইহা আরবী, উর্দু, হিন্দি, এবং ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং এবারই সর্ব প্রথম বাংলায় অনুবাদ করা হইল]

এলীয়া

AwliyaLink, www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com,
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★★

প্রকাশক

শেখ মাহ্‌বুবেল হক

প্রকাশক ঃ শেখ্ মাহবুবেল হক

অনুবাদ ঃ জাফর হায়াতী ও মিসেস্ রহিমা খাতুন।

বাংলায় প্রথম সংস্করণ : ৫ ই রবিউল আউয়াল, ১৪০২ হিঃ
১৬ই পৌষ, ১৩৮৮ বাংলা

মুদ্রণে : দি পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
২, ডি. আই. টি এভেনিউ (সম্প্রসারণ)
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা – ১০০০।

কম্পোজে : ডেস্কটপ কম্পিউটিং লিঃ
১৭০ শান্তিনগর, ঢাকা –১২১৭

AwliyaLink, www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com,
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★★★

শুভেচ্ছা মূল্য : তিন টাকা মাত্র

"বিছমিল্লাহের রহমানের রাহিম"

মূল লেখক জনাব সৈয়দ মাহমুদ গিলানী সাহেবের ইসলামিক গবেষণা এবং সাধনা লব্ধ জ্ঞানের সুফল উর্দ্দু ভাষায় লিখিত বই 'এলীয়া'। 'এলিয়া' মূলতঃ হযরত আলী মুর্ত্তাজা ইবনে আবু তালিব (আঃ) এরই বহু লাকাব বা উপাধিরই একটি হীব্রু ভাষার "এলিয়া", আরবী ভাষায় "আলী"। খাইবার যুদ্ধে হযরত রসুলে মকবুল (দঃ) কর্তৃক যুদ্ধ জয়ের নিশান যখন অসুস্থ বীর কেশরী হযরত আলী (আঃ) এর হাতে অর্পণ করেন তখনই হুজুর (দঃ) তাঁহাকে এই লাকাব বা উপাধির ইঙ্গিত দেন ঃ এখান হইতে ও ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে হযরত আলী (আঃ) এর আবির্ভাবের অনেক আগেই হযরত মুসা (আঃ) এর উপর আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করিয়াছিলেন তাহাতেও হযরত আলী (আঃ) এর কথা বলিয়াছেন।

জনাব সৈয়দ মাহমুদ গিলানী সাহেব অত্যন্ত ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই 'এলিয়া" হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই বিভিন্ন ধর্মের প্রধানগণের এবং নবীগণের প্রার্থনার উছিলা ছিলেন। বস্তুতঃ ইসলামের মাথার মুকুট সরোয়ারে দোঁ-জাহান রসুলে করীম (দঃ) এবং তাঁহার আহ্‌লে বয়াতগণ অর্থাৎ পরম পবিত্র পাক পাঞ্জাতন (দঃ) গণই ছিলেন তাঁহাদের বিপদ-আপদ এবং সর্ব্ব শক্তিমানের দরবারে প্রার্থনার উছিলা।

আমার এক অ-বাঙ্গালী বন্ধু আমাকে একদিন এই উর্দ্দু ভাষার বইখানা পড়িয়া শুনান। ইহার বিষয়বস্তু এবং গবেষণা লব্ধ তথ্য প্রমাণ আমাকে মুগ্ধ করে এবং বাংলায় অনুবাদ করিয়া পাক পাঞ্জাতনের আসেকানদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য উৎসাহিত করে। ইহা বাংলায় অনুবাদ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা সরোয়ারে দোঁ-আলম (দঃ) এবং তাঁহার আহ্‌লে বয়াতগণ অর্থাৎ জনাবে পাক-পাঞ্জাতন (আঃ) দের প্রতি মহব্বত রাখেন, তাহারা যেন এই বইর বিষয়-বস্তু পড়িয়া তাহাদের মহব্বতকে আরো সুদৃঢ় করিতে পারেন এবং সমস্ত বালা মছিবত হইতে নাজাত পাইয়া উপকৃত হন। এই বইখানা বাংলায় অনুবাদ করিতে জনাব এ, জেড, জাফর হায়াতী, জনাব জামিলুল বাসার এবং মোসাম্মৎ রহিমা খাতুন যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাহাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি।

মানব জীবনের সার্থকতা পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহতালা রহমত স্বরূপ নবী করিম (দঃ) কে ১৪০০ বৎসর পূর্বে মানবের মাঝে "রহমতুল্লিল আল্-আমীন" রূপে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পবিত্র কদম মোবারক দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। আমরা কোরান পাকে দেখিতে পাই এবং মানুষের মুখে মুখে শুনি যে তিনি আল্লাহর সর্ব্ব প্রথম সৃষ্টি এবং শেষ রসুল (দঃ) । আমাদের মধ্যে নানাহ ফেকহা এবং মতবাদের জন্য সঠিক তথ্যের অভাবে তাঁহার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করিতে পারি নাই এবং আমরাও সেই অতীতের জাহিলিয়াত যুগের স্বভাব ছাড়িতে পারি নাই।

সুতরাং আমি মনে করি আল্লাহতালা তাঁহার অন্যান্য সৃষ্টির নিকট গৌরব করিবার জন্যই মানুষকে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। তাই সেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানবকুলের কর্তব্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হইলে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু আমাদের জন্য "রহমতুল্লিল আল্-আমীন" সরোয়ারে দোঁ-জাহান হজরত রসুলে মকবুল (দঃ) এর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং রসুল (দঃ) এর সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হইলে অবশ্যই তাঁহার প্রানাধিক আহালে বয়াতগণের সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হইবে। ইহাতেই মানব জীবনের সার্থকতা, কল্যাণ এবং মুক্তির একমাত্র পথ। সুতরাং তাহাদের কর্মজীবনকে স্মরণ রাখিয়া মানব কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারিলেই জনাবে পাক-পাঞ্জাতন (আঃ) দের সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

খোদা হাফেজ। ইতি।

শেখ্ মাহ্বুবেল হক
প্রকাশক

AwliyaLink, www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com,
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★★

সূচীপত্র

১। এলীয়া
২। হযরত সোলায়মান (আঃ) এর রৌপ্যফলক (অনুবাদ সহ)
৩। হযরত সোলায়মান (আঃ) এর মূল রৌপ্যফলক-
৪। হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকার কাঠের পাঞ্জা রৌপ্য ফলক—
৫। হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকার ছামানী ভাষায় লিখিত পাক-পাঞ্জাতনের নাম
৬। হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকার মূল কাঠের ফলক
৭। বাইবেলে আহ্লুল বয়াতের বর্ণনা
৮। ভগবত গীতায় আহ্লে বয়াতের প্রশংসা
৯। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আহ্লে বয়াতের পুনঃ গুণকীর্তন
১০। বেদ্ এবং অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থে আহ্লে বয়াত
১১। মহরমের সময় রাজ সিংহাসন ত্যাগ
১২। কাশ্মীরী পণ্ডিতের বিশ্বাস
১৩। ইমাম হোসেন (আঃ) এর প্রতি মহারাজার ভক্তি
১৪। হোসাইনী ব্রাহ্মণ

* মহাভারতের বর্ণিত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কি আলী! আলী! বলিয়া চিৎকার করিয়াছিলেন ?

* মহাত্মা গৌতম বুদ্ধকেও কি আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (আঃ) তৌহিদের শিক্ষা দিয়াছিলেন ?

* হযরত নূহ (আঃ) কি তুফানের সময় পাক-পাঞ্জা-তনের নাম নিরাপত্তার জন্য খোদিত একখানি ফলক নৌকায় রাখিয়াছিলেন ?

* হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান (আঃ) কি নিজেদের মুক্তির জন্য পাক-পাঞ্জাতনের উছিলা ধরিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন ?

'বিছমিল্লাহীর রহমানের রাহীম'

পড়ুন

শিয়ালকোট, পাকিস্তানের ইসলামিক গবেষক ও লেখক জনাব হাকিম সৈয়দ মাহমুদ গিলানীর কিছু প্রবন্ধ 'নেদা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা জ্ঞান পিপাসু ও সত্যের সাধকদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে।

বক্তৃতা বা তর্ক করা খুবই সহজ। কিন্তু অতীতের ঘটনাপুঞ্জ মন্থন করিয়া মূল সত্য উদ্‌ঘাটন করা বাস্তবিকই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। নিশ্চয়ই হাকিম সাহেব তাঁহার আমৃত্যু ইসলামিক গবেষণা ও সাধনা লব্ধ জ্ঞান, শুধু মাত্র মুসলমানদের নয় বরং দুনিয়ার সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের সন্দেহ ও অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া এক জ্যোতির্ময় দিগন্তের সন্ধান দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার লিখিত 'এলীয়া' পড়িয়া সত্য ও মুক্তির পথ অনুধাবন করিয়াও যাহারা ইহা অনুস্মরণ করিবে না, তাহারা বাস্তবিকই অভাগা।

ইসলামের পাক-পাঞ্জাতন—অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (দঃ), হযরত ফাতেমা জাহেরা (আঃ) হজরত আলী (আঃ), হযরত হাসান ও হোসেন (আঃ) আলাহর পরেই সর্ব সম্মানের অধিকারী।

হাকিম সাহেবের গবেষণায় সর্ব্বোতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মহাভারতে বর্ণিত কুরু পাণ্ডবের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ আলী আলী বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন এবং তাঁর উছিলা ধরিয়া সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রও আমীরুল মুমেনীন (আঃ) এর আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন।

হযরত নূহ (আঃ) মহা প্রলয়ের মধ্যে নিজের নৌকা ও আরোহীদের নিরাপদ রাখিবার জন্য পাক-পাঞ্জাতনের নাম কাঠের ফলকে ক্ষুদিত করিয়া ঐ ফলক নৌকায় রাখিয়াছিলেন। অদ্যাবধি উহা বিদ্যমান।

হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান (আঃ) পাক-পাঞ্জাতনের বিশেষ করিয়া হযরত আলী (আঃ) এর দোহাই দিয়া আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

গৌতম বুদ্ধ, তাঁহার যুগে এশিয়া মহাদেশের অন্যতম প্রধান মুক্তিদাতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তিনিও বিপদের সময় হযরত আলী (আঃ) এর দোহাই দিয়াছিলেন। আলাহর এই নূর হযরত আলী (আঃ) গৌতম বুদ্ধকে তৌহিদের শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জনাব হাকিম সাহেবের উপরোক্ত তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থে মূল সত্য পূর্ণভাবেই অবগত হইতে পারিবেন। সুতরাং মানব কল্যান ও মুক্তির সত্য ও সঠিক পথ উদ্‌ঘাটন করিয়া আল্লাহর দরবারের সার্থক পুরস্কার গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এই হাকিম সাহেব একাধারে ৩২ বৎসর যাবৎ আহ্‌লে হাদিসের অনুসারী নিলেন এবং সেই মোতাবেক বহুল প্রচারিত আহ্‌লে হাদিসদের একাধিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং বহু তথ্য মূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

আশা করি তাঁহার সংগৃহীত তথ্যাবলী সমগ্র মানব কল্যাণের সহায়ক হইবে।

ওয়াচ্ছালাম,

২১শে রমজানুল মোবারক,
১৩৮১ হিঃ

মেরাজ উদ্দিন খাজা
জেনারেল সেক্রেটারী
'মারেফুল ইসলাম' মাসিক পত্রিকা
লাহোর, পাকিস্তান।

এলীয়া

[পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মুক্তির কেন্দ্র বিন্দু]

জনাব হাকিম সৈয়দ সরফরাজ হোসেন সাহেবের ইসলামিক গবেষণা মূলক রচনা 'এলিয়া' (হযরত আলী (আঃ) এর লাকাব।) যাহা মাসিক পত্রিকা 'মারেফে ইসলাম' আলী ও ফাতেমা সংখ্যা ইংরাজী ১৯৬১ সনের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে তিনি যেভাবে পরিশ্রম ও কঠিন গবেষণা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এ ধরনের আধুনিক গবেষণামূলক রচনাবলী বর্তমান সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ ইমান সুঠাম ও মজবুত রাখার জন্য উহা অত্যাবশ্যক।

হাকিম সাহেবের উক্ত রচনা নিঃসন্দেহে যুক্তি বা সমালোচনার অপক্ষো রাখেনা। অগণিত পাদ্রী এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের পণ্ডিতগণ এবং তাহাদের ধর্মীয় সংস্থা 'এলিয়াকে' আলী বলেই সাব্যস্ত করিয়াছেন ও মানিয়া চলিয়াছেন। দুনিয়ার শেষ জামানার একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। অর্ধ শতাব্দী বা তারও পূর্বে সেন্টপল্ চার্চ, লণ্ডনের এক বিখ্যাত পাদ্রী মিঃ জে, বি, গ্লাডন-এর লিখিত পুস্তক 'A Note Book on old & New Testaments of Bibles'-এ লিখিয়াছেন, "In the language of oldest and present Hebrew, the word ALLIA or AILLEE is not in meanings of God or Allah but this word is showing that in the next and last time of the world any one will become nominated "Allia or 'Aillee." অনুবাদ : পুরান ও নতুন যুগের হিব্রু ভাষার বাইবেলে 'এলিয়া' অথবা 'এলি' আল্লাহর নাম নয়। উহা আল্লাহর নামে ব্যবহৃত হয় না, বরং এই শব্দদ্বয় হইতে বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে অথবা শেষ যুগে কোন এক মহান ব্যক্তির আগমন হইবে যাঁহার নাম 'এলিয়া' অথবা 'এলি' হইবে [বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন : A Note Book of old and New Testament of Bible. Vol-1, Page No. 427 & 428. Published by William A. Hollard press, England. 1908.]

একটি খৃষ্টান মিশনারীর মুখপত্র হইতে 'এলি' পাক-পবিত্র নামের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ইহার চেয়ে অধিক আর কি-বা হইতে পারে ! ঐ মুখপত্র পরিষ্কারভাবে স্বীকার করিতেছে যে 'এলিয়া' অথবা 'এলি' আল্লাহ নয়, ইলিয়াস নয়, যোহন নয়, ঈশা নয়, বরং তিনি হযরত ঈশার পরে আসিবেন। খৃষ্টানগণ আজও যদি হযরত আলী (আঃ) কে স্বীকার না করে এবং সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হিসাবে স্বীকার না করে, তাহাতে 'এলি' শব্দের কোন দোষ নাই। কারণ ইহা তাহাদের দলীয় এবং ব্যক্তি স্বার্থেরই কারণ।

ইহা ছাড়াও যদি নিরপেক্ষ গবেষণা ও চিন্তাধারার মধ্য থেকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হয় তবে সিদ্ধান্তে পৌছাতে মোটেই বেগ পাইতে হইবে না যে, 'এলিয়া' অথবা 'এলি' ই মানব মুক্তির কেন্দ্র বিন্দু। ইহাই পৃথিবীর বিখ্যাত সাধক, গবেষক ও পণ্ডিতদের অভিমত ! সুতরাং তাহারা যে কোন বিপদ-আপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য হযরত আলী (আঃ) কে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহার দরবারেই ফরিয়াদ করিতেন। উদাহরণস্বরূপ : ঐতিহাসিক কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে, শ্রী কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে সত্যের সাধকগণ সংখ্যায় অতি নগণ্য এবং বিরুদ্ধদল এমনভাবে সংবদ্ধ ছিল যেন মাজরা পোকারদল। তখন মহারাজ কৃষ্ণ তার সৈন্যদের প্রয়োজনীয় আদেশ-উপদেশ দিয়া তিনি একটি নির্জন ও রক্ষিত স্থানে গমন করিলেন এবং আপন প্রভুর দরবারে নত মস্তকে আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। যাহার বংগানুবাদ নিম্নরূপ : " হে পরমেশ্বর! হে দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা ! তোমার দোহাই। তুমি আকাশ-পাতাল সৃষ্টি করিয়াছ; এবং তাঁহার দোহাই যিনি তোমার বন্ধুর বন্ধু, তোমার প্রিয়তমের প্রিয়তম; তাঁহারই দোহাই যাহার নাম 'আহলী' যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপাসনালয়ের কাল পাথরের নিকট নিজের অলৌকিক ঘটনা দেখাইবেন। হে প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর। মিথ্যা রাক্ষসদের ধ্বংস কর আর সত্যকে জয়যুক্ত কর। হে প্রভু এলা-এলা-এলা। [কৃষ্ণ বিত্তি, সম্পাদনায় পণ্ডিত রামধন। পৃষ্ঠা—৭২। প্রকাশক : সাগরী পুস্তকালয়, দিল্লী, ভারত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে]। শ্রী কৃষ্ণের উপরোক্ত প্রার্থনার প্রত্যেকটি শব্দ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, কত সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে এবং কত বিনয়ের সহিত বলিয়াছেন যে, আকাশ ও পাতালের সৃষ্টির মূল কারণ অর্থাৎ 'লাওলাক্ লামা খালাক্তুল আফ্লাক্' কে ডাকিতেছেন। আবার এই আকাশ-পাতাল সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর প্রিয়তমের প্রিয়তম হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর নামে কত মধুর কাকুতি-মিনতি করিয়াছেন এবং সবশেষে তাঁর পবিত্র নাম 'এলা' জপ করিয়াছেন।

আহ্লী ইহা সংস্কৃত ভাষার একটি প্রাচীন শব্দ যাহা আরবী ভাষায় 'আলী' অথবা আ-লী। তদুপরি শ্রী কৃষ্ণ নিজেই এই পবিত্র নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ' সে ' (আলী) দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মন্দিরের (অর্থাৎ পবিত্র কাবাঘরে) কাল পাথরের (অর্থাৎ হাজরে

আছওয়াদ) -এর নিকট অলৌকিক ঘটনা দেখাইবেন। সবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ৩ বার 'এলা' বলিয়াছিলেন।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে 'এলা' কে ? যাইহোক ইহার অর্থ লেখকের ব্যাখ্যা হইতে নয় বরং বেদশাস্ত্রের পণ্ডিত কৃষ্ণ গোপাল বলিয়াছেন, "সংস্কৃত ভাষা পুরাতন ভাষাগুলির অন্যতম। ঐ প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে দুই-একটি শব্দ আধুনিক সাহিত্যে আজও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান, ইহার মধ্যে 'এলা' উল্লেখযোগ্য। ইহা একজন মহান ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিতেছে; এবং 'আহ্ল' অথবা 'আহ্লী' অথবা আলী শব্দেরই রূপান্তর। পুরাতন যুগের বেদ গ্রন্থে এই ধরনের অনেক শব্দ পাওয়া যায়। যার কারণে সন্দেহ হয় যে ঐ শব্দগুলি আরবীরই রূপান্তরিত অবস্থা, অথবা ইহাও সম্ভব যে ঐ শব্দগুলি সংস্কৃত, কিন্তু পরবর্তীকালে আরবী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।" [গ্রন্থ 'নাগর সাগর', লেখক: পণ্ডিত কৃষ্ণ গোপাল। প্রকাশক: নারায়ণ বুক ডিপো। মুদ্রণে : সম্পূর্ণ প্রেস। আগ্রা, ১৯১৭ খৃঃ। পৃঃ নং—২১১, দ্বিতীয় সংস্করণ।]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় এলা ও আহ্লী শ্রী কৃষ্ণ নিজের প্রার্থনায় ব্যবহার করিয়া হযরত আলী (আঃ)-এরই করুণা কামনা করিয়াছেন। সে-জন্যই তিনি এই পবিত্র নামকে পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছেন। একান্তই যদি তাহা না হয় তবে যাহারা সংস্কৃত ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত তাহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং দাবী : আপনারা উহার সঠিক ব্যাখ্যা করেন। আর পৃথিবীর বৃহত্তর মন্দিরও কোথায় যেখানে কাল পাথর আছে, যেখানে 'আহ্লী' অথবা এলা তাহার অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

দাউদ (আঃ)-এর পবিত্র যবুর কেতাবের কয়েকটি পদ যাহা পুরাতন ইব্রানী ভাষায় লিখিত আছে। যাহার বঙ্গানুবাদ : "এটা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় যেন উহার হুকুম পালন করি, সম্মান করি। যাহার নাম 'এলি' তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলে দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা অর্জিত হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মানিত ব্যক্তিত্ব 'হদর' (হায়দার) নামেও অভিহিত করা হয়। যিনি অসহায়ের সহায়, যিনি সিংহের মত শক্তিশালী, অত্যন্ত ক্ষমতাবান এবং তিনি কাবা ঘরে জন্ম নিবেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিজের আমিত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিলাইয়া দিয়া তাহারই গোলামী করা। যাহার কান আছেন শুনুন, যাহার বুদ্ধি আছে তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়া নেন, যাহার হৃদয় আছে তিনি চিন্তা করেন। কারণ সময় চলিয়া গেলে তাহাকে ধরা যায় না। যাইহোক আমার আত্মা, দেহ, আমার মন একমাত্র তাহার উপরই নির্ভর করে।" [বর্তমান যুগের বাইবেল হইতে অনেক কিছু বাদ অথবা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। সত্য কালাম অনেক ক্ষেত্রেই বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ঐ সমস্ত

কথাই যাহা পাক-পাঞ্জাতন সম্বন্ধে লেখা ছিল। উপরোক্ত ঐ ব্যাখ্যা এখনও মূল ইসরাইলী ভাষায় দামেস্কে এক পাদ্রীর অধীনে সংরক্ষিত আছে। মিসরের এক বিখ্যাত মুফ্‌তি দাবী করিয়াছেন যে, তিনি ঐ লেখাগুলি দেখিয়াছেন। আজ ঐ সমস্ত দলিল সর্ব-সমক্ষে প্রকাশ করিলে বর্তমান খৃষ্টানদের ধর্মীয় ভিত্ ধসিয়া পড়িবে।] (পত্রিকা আল্ হারাম, কায়রো, মিশর, ১২৭৪-৭৬ হিঃ)

দাউদ (আঃ) এর উপরোক্ত প্রার্থনায় কোন কাল্পনিক বা সন্দেহজনক শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, 'আলীর অন্য একটি নাম হায়দারও হবে। তিনি ইহ-পরকালের মানব মুক্তির উছিলা ও চাবি কাঠি। এই মহান ব্যক্তি পবিত্র কাবা ঘরে জন্ম নিবেন। তাঁহার পায়রবী করিলে সমস্ত কাজ সফল হইবে। তিনি সিংহ (আছাদুল্লাহিল্ গালির), তিনি একক শক্তিমান (আলাল ক্বাবী ইয়াদুল্লাহ, কুয়াতুল্লাহ) এবং আমার দেহ, মন, প্রাণ একমাত্র তাঁহারই উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আপদ-বিপদের সময় তিনিই আমার সাহায্যকারী। হযরত দাউদ (আঃ) জনগণকে হুঁশিয়ার করিয়া বলিয়াছেন যে সময় চলিয়া যায় সে সময় আর ফিরিয়া আসে না, সেই জন্যই প্রত্যেকের উচিত হযরত আলী (আঃ)-এর পায়রবী করা, নতুবা দুনিয়া ও আখেরাতে শোকার্ত হইবে।'

এখন ছোলায়মান (আঃ) এর বাণী শোনেন : তাঁহার উপরে যে ছহিফা নাজিল হইয়াছে উহার নাম 'গজলুল গজলাত'-এর ৫ম অধ্যায়ের পুরাতন ইব্রানী ভাষায় ছাপা হইয়াছিল ১৮০০ খৃঃ । সেখান হইতে কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ ঃ ' আমার প্রিয়; যাহার গায়ের রং উজ্জ্বল ও লাল, হাজার হাজার লোকের মধ্য হইতে যাহাকে চেনা যায়। তাঁহার পেশানীর নূর বড় বড় হীরার টুক্‌রার বিচ্ছুরিত আলোর মত , জুলফ্ মোবারক থরে থরে (কোঁকড়ানো) সাজানো এবং মিহি কালো তার চক্ষুদ্বয় এমন যে দুধে ধোয়া বড় বড় থালার মধ্যে পরিষ্কার পানি এবং তার মধ্যে ২টি পায়রা সাঁতার কাটিতেছে অথবা যেমন ২টি মূল্যবান পাথর নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করিয়া আলো বিকিরণ করিতেছে। তাঁর চেহারা মোবারকের সাথে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া যেন সুগন্ধী লতা গুল্ম শোভা পাইতেছে। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে সুগন্ধের প্রস্রবণ বিগলিত ধারায় বহিয়া যাইতেছে। ঠোঁটদ্বয় গোলাপের পাপড়ির মত যাহা হইতে এক ধরনের সুমিষ্ট খোশ্‌বু বহিয়া যাইতেছে। তাঁহার হাত মোবারক মূল্যবান স্বর্ণের তৈরী যাহাতে নূর চমকায়, তার পেট হাতির দাঁতের মত সাদা এবং জহরত দিয়া ঢাকা। যাহার পা' মোবারক মার্বেল পাথরের খাম্বার মত যাহা স্বর্ণের পাতের উপরে বসানো, তার চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝল্‌মল্ করে। চন্দন গাছের মত সুন্দর সুঠাম যুবক, অত্যন্ত দয়াশীল; তিনিই আমার একান্ত বন্ধু মোহাম্মদ (ছঃ) হে জেরুজালেমের মহিলাগণ।' [ছহিফা 'গজলুল

গজলাত', ৫ম অধ্যায়, বাক্য ১ : ১০, ইব্রানী ভাষা ১৮০০ খৃঃ, বৃটিশ বাইবেল এ্যাসোসিয়েশান।]

নোটঃ [বাইবেলের নূতন অধ্যায় হইতে 'গজলুল গজলাতের' উপরোক্ত অংশটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে। এবং উহা হইতে এই বাক্যগুলি 'আমার বন্ধু মোহাম্মদ একেবারেই বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টব্দে বা তারও পূর্বে যে বাইবেল ছিল তাহাতে উহা বিদ্যমান ছিল। এই কাটছাট ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পরেই সংগঠিত হইয়াছে।]

হযরত ছোলায়মানের উপরোক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার পেশাণীর নুর বড় বড় হীরার টুকরার বিচ্ছুরিত আলোর মত— এ বাক্য দিয়া হযরত আলী (আঃ) কে ইঙ্গিত করিয়াছেন। যেহেতু, রছুল (দঃ) নিজেই বলিয়াছেন, "আলীউন মিন্নি বে-মানজেলাতের রাছে মিন্ জাছাদী"— অর্থাৎ আলী আমার দেহের মাথার মত। সুতরাং হযরত ছোলায়মান (আঃ) হযরত আলী (আঃ) কে রছুলের মস্তকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তদুপরি মাথার নুর বলিয়া বক্তব্য আরো পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। রছুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "আনা নূরুন ওয়া আলীউন নূরুন' অর্থাৎ আমিও নূর আলীও নূর। 'আনা ওয়া আলীউন মিন্ নূরীন্ ওয়াহিদ' অর্থাৎ আমি এবং আলী একই নূর হইতে। ইহা হইতে বুঝা গেল হুযুর (দঃ)-এর পেশানী মোবারক এবং হযরত আলী (আঃ)-এর নূর একই। পুনঃ আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাঁর নূর হীরার মত ঝলমল করে। লক্ষ্য করুন যে 'বন্ধুর (রছুলে খোদা) মাথার নূর আলী (আঃ) কে হীরার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে যে হীরার টুকরা প্রকৃতিগত কারণেই খনিতে পাঁচ কোনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহা যখন রৌদ্রে অথবা অলোর সামনে থাকে তখন ৫টি আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। সুতরাং হযরত সোলায়মান (আঃ) হযরত আলীকে হীরার সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহার প্রিয় পাক পাঞ্জাতন-এর সঙ্গে জড়িত এবং হযরত আলীও এই পাক্-পাঞ্জাতনের সঙ্গে জড়িত আছেন। 'তার মিহি কাল চক্ষুদ্বয় এমন যে দুধে ধোয়া বড় থালার মধ্যে পরিষ্কার পানি এবং তার মধ্যে ২টি পায়রা সাঁতার কাটিতেছে অথবা দুটি মূল্যবান পাথর সুন্দরভাবে অবস্থান করিয়া আলো বিচ্ছুরণ করিতেছে।' অর্থাৎ দুটি চক্ষু দিয়া হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাতী হযরত হাসান ও হোসেন (আঃ) কে বুঝাইয়াছেন। হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন, 'আল-হাসান ওয়াল হোসাইন এনানী' (ছিরাতুছ ছালেহীন পৃঃ ৫৭) অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন আমার দুটি চক্ষু। আবার বলিয়াছেন, 'আল-হাসান ওয়াল হোসাইন কোররাতুল আইনানী' (ছিরাতুল আইম্মা সাআবানী—১১৯ পৃঃ) অর্থাৎ হাসান এবং হোসাইন আমার চোখের শীতলতা। 'দুধে ধোয়া' একটি শব্দ গুচ্ছ, ইংরাজীতে যাহাক বলা হয় ফারঅসএ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে পবিত্র। জনৈক আরবী কবি, আছাদী 'আল্লাহ পাক' এবং আল্লাহ পাক

সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ওয়াল আবাসা মাগছুলাতা মিন লাবানাল মোতাহার ওয়াবিল মায়েছ ছাফা ফালা বে মেছ্লে তাফাখার" অর্থাৎ উহার মহান সিংহাসন বিশুদ্ধ দুধ এবং পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে। অবশ্য এর জন্য কেহই গর্বিত হইতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। একজন ইরানী হানাফী কবি জনাব আছার তেহরাণী ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন (আঃ)–এর প্রশংসায় লিখিয়াছেন, ও সাব্বার বা ছাফা। "আঁ দৌচশমানে নবী শব্বির

আঁ দৌ চশ্মা শছ্তাদার চারখে বারি আজুশীর ও আর।
আঁ দোঁ চশমা নবী নূরে নেগাহে মোস্তফা।
মাদারে আঁ সৈয়েদা ও অলিদে আঁবুতরাব।"

অর্থাৎ :– পাক পবিত্র দেহ ও আআ ওয়াল হাসান এবং হোসেন নবী করীম (দঃ)–এর দু'টি চক্ষু, যাহাকে আসমানে দুধ ও পানি দ্বারা ধোয়া হইয়াছে। হুযুর (দঃ)–এর এই দুইটি চক্ষু তাঁর পাক চোখের নূর; যাঁহাদের মাতা সরদারে দো আলমের কন্যা হযরত সৈয়েদা এবং পিতা হযরত আবু তোরাব (আঃ)। সুতরাং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, হযরত ছোলামান (আঃ) নিজের প্রিয় হযরত মোহাম্মদ (দঃ)–এর জিকিরে হযরত ইমাম হাসান ও হোসেন সম্মন্ধে বলিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত হুযুর (দঃ)–এর ২টি চক্ষুর (হাসান ও হোসেন) তুলনা ২টি কবুতরের সঙ্গে করা অর্থাৎ ধর্মীয় ও রূহানী দৃষ্টিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যেহেতু কবুতর সমস্ত পাখী জাতির মধ্যে পাক পবিত্র এবং ইহার প্রতীক স্বরূপ। কবুতর পুরাকালে একস্থান হইতে অন্য স্থানে খবরাখবর পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত হইত। ইহা নবীগণের প্রতীক। বর্তমান যুগে ইহা শান্তির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাশিয়ায় ইহাকে একটু পরিবর্তন করিয়া শান্তির প্রতীক হিসাবে ঘুঘুকে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় কবুতরকেই শান্তির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে এমনকি তাদের শান্তির দেবতার মাথার উপরে কবুতর মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া রাখে। সুতরাং হাসান এবং হোসেন (আঃ)–কে কবুতরের সঙ্গে তুলনা করায় প্রমাণ করিতেছে যে এই দুই পাক পবিত্র ব্যক্তি আল্লাহর শেষ বাণীর (কোরান পাক) হেফাজতকারী এবং এনাদের দ্বারা দুনিয়ার মানুষ কোরান পাকের তালিম বুঝিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ হুযুর (দঃ)–এর ২টি চোখের নূর দাঙ্গা–হাঙ্গামা শেষ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইমাম হাসান (আঃ) বিষ খাইয়াও অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়া অত্যাচার ও যুলুমের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। হোসেন (আঃ) কারবালার প্রান্তরে যে অপরিসীম ধৈর্য্য

ধারণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বর্বরতা ও অসুরতাকে চিরতরের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এ কারণেই হযরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁর গানে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)–এর প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্লে বয়াতের প্রশংসাও করিয়াছেন।

১৯১৬ খৃঃ সংগঠিত প্রথম মহা যুদ্ধ পৃথিবীর মানুষের জন্য কেয়ামত স্বরূপ ছিল। সে সময় বায়তুল মোকাদ্দাস্ হইতে কয়েক মাইল দূরে এক সৈন্যদল তার প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার অভিপ্রায়ে সম্মুখে তীব্র বেগে অগ্রসর হইতেছিল। পথিমধ্যে 'উনাত্রা' নামক একটি ছোট গ্রামের ১টি টিলা হইতে অন্ধকার রাত্রে একটি আজব আলোরশ্মি বাহির হইতে দেখিল। এই আজব আলোর রশ্মি দেখিয়া সৈন্যদল থমকিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুসংখ্যক সৈন্য ব্যাপারটা অনুধাবন করার জন্য ঐ আলো রশ্মির নিকটে গেল। তাহারা দেখিল যে ঐ আশ্চর্যজনক আলোরশ্মি মাটি ও পাথরের টিলার ফাটল দিয়া বাহির হইতেছে। তখন তাহারা উহা খনন করিতে লাগিল। মাটি খুঁড়িয়া প্রায় ৪ গজ নীচে একটি রৌপ্যের ফলক আবিষ্কার করিল যাহা হইতে ঐ আলোরশ্মি বাহির হইতেছিল। পৌনে একগজ লম্বা ও আধাগজ চওড়া ফলকটি যখনই তাহারা হাতে নিল তখনই আলো বিচ্ছুরণ বন্ধ হইয়া গেল। উহা পাইয়া সৈন্যদল খুবই আনন্দিত হইল কিন্তু বন্ধ হইয়া যাওয়াতে দুঃখিত হইল এবং শঙ্কিত হইল। অবশেষে তাহার ঐ ফলকটি তাহাদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকটে নিয়া গেল। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ যার নাম ছিল মিঃ এ. এন. গ্র্যাণ্ডেল। তিনি টর্চ লাইটের আলোতে ফলকটি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। উহার চারিদিকে অত্যন্ত মূল্যবান পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল এবং মাঝখানে স্বর্ণাক্ষরে অত্যন্ত পুরাতন ভাষায় কিছু লেখা ছিল। অতএব ঐ লেখা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অবশ্য তার ধারণা হইল যে উহা একান্ত সাধারণ জিনিস নয়। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, এ লেখা অত্যন্ত সম্মানীয় ও গোপনীয় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশেষে উহা বহু অফিসারদের হাত বদল হইয়া তাহাদের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেঃ ডি. ও. গ্লাডস্টোন–এর হাতে পৌছিল। তিনি উহা বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদদের হাতে পৌছাইয়া দিলেন।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের শেষে ১৯১৮ খৃঃ বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ও অন্যান্য দেশের প্রাচীন ভাষার পণ্ডিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাহার দীর্ঘ কয়েক মাস কঠিন পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া তাহারা উহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হন। ইহাতে জানা যায় যে, উক্ত রৌপ্য ফলকটি হযরত ছোলায়মানের ছিল এবং উহার লেখাগুলি প্রাচীন ইব্রানী ভাষার, যে ভাষায় 'যবূর' ও গজলুল গজলাত' লেখা।

গবেষণা কমিটির সদস্যগণ ফলকে লেখা হযরত আহম্মদ, আল বতুল, হাসান ও হোসেনের নাম পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাহারা একে অন্যের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। অবশেষে উহা বৃটেনের রাজকীয় যাদুঘরে রক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু

লর্ড পাদ্রী এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১লা মার্চ ১৯২৩ খৃঃ একটি গোপনীয় আদেশ জারী করিলেন, উহা নিম্নরূপ ঃ "যদি এই ফলক কোন যাদুঘরে রাখা হয় অথবা এমন কোন জায়গায় যেখানে জনসাধারণ অবাধ চলাফেরা করে, তবে খৃষ্টান ধর্মের ভিত অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং উহা চিরতরে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং উক্ত ফলককে ইংলণ্ডের গির্জার একান্ত গোপনীয় কক্ষে রাখাই শ্রেয়, যেখানে জনসাধারণের অবাধ একান্ত যাতায়াত নাই।"

ফলকটিতে ইব্রানী ভাষায় লিখিত শব্দগুলির আরবী ও বাংলা অনুবাদসহ প্রদত্ত হইল :

আজ পর্যন্ত এ ফলকটি ইংলণ্ডের রাজকীয় যাদুঘরের গোপন কক্ষে রক্ষিত আছে [দেখুন ঃ (১) 'ওয়াণ্ডার ফুল ষ্টোরীজ অব ইসলাম', লেখক : কর্ণেল পি, সি, ইমপ্লে, লণ্ডন, পৃষ্ঠা ২৪৬ (২) রিছালে হাকিকাতে গারাবিয়া। লেখক : আবুল হাছান সিরাজী, পৃঃ ২১–২৪]

বরফ জমিলেও পানি–আবার গলিয়া গেলেও পানি। সত্য লোহার সিন্দুকে আটকাইয়া রাখা যায় না। হযরত ছোলায়মান (আঃ)–এর রূপার ফলক গবেষক ও বিশপগণ আপ্রান চেষ্টা করিয়াও লুকাইয়া রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছে। এই খবর আজ দুনিয়ার মানুষ জানিতে পারিয়াছে। কারণ এমন কোন শক্তি নাই যে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও হযরত আলী (আঃ)–এর নূরে কোন বাধার সৃষ্টি করিতে পারে; পাক পাঞ্জাতনের নূরকে নিবাইয়া দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ঐ রৌপ্য ফলক সম্মন্ধে একটি গল্প প্রচলিত ছিল যাহা নিম্নরূপ ঃ

টমাস ঃ ওহে উইলিয়াম ! তুমি কি রৌপ্যফলক সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছ?

উইলিয়াম ঃ হ্যাঁ, আমি ঐ আশ্চর্য্যজনক খবর শুনিয়াছি।

টমাস ঃ এখন তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়াছ?

উইলিয়াম ঃ ইহা অত্যন্ত সংকটজনক ব্যাপার? আমাদের ধর্মীয় নেতাগণ এ সম্বন্ধে মতানৈক্য করিতে পারেন। কিন্তু আমি ....।

টমাস ঃ হাঁ । হাঁ । বল । থামিয়া গেলে কেন? প্রত্যেক ব্যক্তির ভালমন্দ বিচার করার স্বাধীনতা আছে। এটা কোন রাজনীতির সমস্যা নয় যে উহা প্রকাশ করিলে রাজদণ্ডের ভয় আছে। তুমি নিশ্চিত ও নিঃসংকোচে বলিতে পার।

উইলিয়াম ঃ ভাই টমাস । আমার আত্মবিশ্বাস যে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামই বলবৎ থাকিবে। টমাস তুমি চিন্তা করিয়া দেখ যে অতীতের সমস্ত নবীপয়গম্বরগণ হাজার হাজার বৎসর পূর্বে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)–এর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং তাঁহার উছিলা ধরিয়া সাহায্যও প্রার্থনা করিয়াছেন। তুমি যদি কিছু মনে না কর, তবে আমি সত্য কথাই বলি। আমাদের বাইবেলেও অগণিত ইঙ্গিত আছে যে হযরত মোহাম্মদ শেষ নবী হইবেন এবং তাঁর বংশধরগণও এক সম্মানিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন।

টমাস ঃ বেশ ভাল। বাস্তবিকই তুমি সঠিক কথা বলিয়াছ। যদি আমরা এগুলি ঘৃণা ও স্বার্থ হীন চিত্তে ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে সাম (পুরাতন ধর্ম্ম গ্রন্থ)

গ্রন্থে উহা পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারিব। তাহাছাড়াও ইসলামের ইতিহাস দেখিতে পারো, সেখানে আলী ও হোসেনের বীরত্বপূর্ণ ঘটনা লেখা আছে উহা পড়িলেই বোঝা যায় যে তাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তির এমন অধিকারী ছিলেন যাহা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

উইলিয়াম ঃ এ কথা আমিও স্বীকার করি। কারণ ঐতিহাসিক ঘটনা মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং কেহ মানুক কি না মানুক তাতে কিছু যায় আসে না। স্বয়ং আল্লাহ নিজেই তাঁহাদের প্রশংসা করেন। আমি বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে কোরান পাকে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার আহ্‌লে বয়াতের শানে অনেক কিছু লেখা আছে। এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত যে কোন্ পথ আমরা অবলম্বন করিব ! অন্ধের মত খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর বলবৎ থাকিব না সত্য সন্ধানে অন্য পথ খুঁজিয়া লইব। টমাস : ভাই উইলিয়াম। তুমি বিশ্বাস করো কি না করো আমি এখন হইতেই মুসলমান হইয়া গেলাম। এ মুহূর্ত হইতেই তুমি আমাকে ইসলামের পাক-পাঞ্জাতনের গোলাম হিসাবে গণ্য করিতে পারো। যাহাদের পাক-পবিত্র নাম রৌপ্য ফলকে লেখা আছে।

উইলিয়াম ঃ আর দেরী কেন? চল আমরা এখনই কোন ইসলামিক দেশে চলিয়া যাই এবং কলেমা পড়ি।

টমাস ঃ সত্যিই !!

উইলিয়াম ঃ হাঁ বিশ্বাস করো। আমি তো তোমার পূর্বেই মুসলমান হইয়া গিয়াছি। কোন ইসলামিক দেশে যাওয়ার দরকার নাই। ইরানের এক বড় আলেম (মুস্তাহীদ) নিউ ক্যাসেলে আসিয়াছেন। চল আমরা সেখানে গিয়া বয়েত হই।

এই উভয় ভাগ্যবান ব্যক্তি নিউ ক্যাসেলে গিয়া জনাব মাওলানা হাছান মুস্তবা তেহরাণীর হাতে বয়াত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। টমাসের নাম বদল করিয়া ফজলে হোসেন এবং উইলিয়ামের নাম করমে হোসেন রাখিলেন। এই ঘটনার ২ বৎসর পরে এই ব্যক্তিদ্বয় ১৯২৫ খৃঃ কাবা ও কারবালায় হজ্জ ও জিয়ারত করিয়াছেন।। [From : Muslim chronicle London, 3rd, December 1926 & Resalae Al-Islam, Delhi, feb, 1927.]

হযরত দাউদ ও হযরত ছোলায়মান (আঃ) এর গান আজ অতি প্রাচীন এবং রৌপ্য ফলকের কাহিনীও প্রায় ৪০/৫০ বৎসরের পুরাণ ঘটনা। সুতরাং ঐ সমস্ত আলোচনা এখানে ক্ষান্ত করিয়া আধুনিক গবেষণার দিকে দৃষ্টিপাত করি ঃ—

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে রাশিয়ার একদল গবেষক কোহেকাফ্ পাহাড়ের পাদদেশ পরিদর্শন করিতে ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহারা কোন নতুন খনির অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। মাটি জরিপ করিতে গিয়া এক জায়গায় কিছু পচা কাঠের টুকরা দেখিতে পাইলেন। তখন দলের অধিনায়ক অতি আগ্রহের সহিত ঐ জায়গাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। মাটির নীচে অনেকগুলি সাজানো কাঠ পাইয়া অবাক হইয়া গেলেন। থরে থরে সাজানো কতগুলি কাঠ দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জায়গাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। এবং প্রচুর পরিমাণে কাঠ ও অন্যান্য জিনিস পত্র পাইলেন। ইহার মধ্যে পাঁচ কোনা বিশিষ্ট একটি সুন্দর ফলকও পাইলেন। ১৪ ইঞ্চি চওড়া ঐ ফলকটি পাইয়া তাহারা বিস্মিত হইলেন যে উহা অন্যান্য কাঠের তুলনায় সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় আছে। উক্ত ফলকটি সম্বন্ধে গবেষকগণ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে ১৯৫২ ইং সনে তাহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে, ইহা নূহ (আঃ)-এর নৌকায়ই উক্ত ফলকটি রক্ষিত ছিল এবং ইহাতে অতি প্রাচীন ভাষার কিছু লেখা ছিল। এ লেখা জানা বা বোঝার পূর্বে নূহ (আঃ)-এর যুগের ইতিহাসেরে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

৮ হইতে ৯ শত বৎসরের এক বৃদ্ধ রাস্তার ধারে মস্ত বড় এক কাঠের নৌকা তৈরী করিতে ছিলেন। তিনি কয়েক শতাব্দী যাবৎ জনসাধারণকে ধর্মের ও আল্লাহর দিকে আহ্বান করিতে ছিলেন যে, "হে লোক সকল আমি তোমাদের মনে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের ভয় সঞ্চার করার জন্য আসিয়াছি। তোমরা আল্লাহর এবাদত করো এবং তাঁর ভয় করিয়া পরহেজগার হইয়া যাও।" কিন্তু জনসাধারণ তাঁহার ঐ উপদেশপূর্ণ কথায় কর্ণপাত করিতেছিল না। তদুপরি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত ও নানাভাবে আপদে-বিপদে ফেলার চেষ্টা করিত। অবশেষে সেই বৃদ্ধ আল্লাহর কাছে মোনাজাত করিলেন, "রবেব লা তাজার অর্থাৎ হে মাবুদ ইহাদের উপর আজাব নাজিল করো। তুফান অথবা বন্যা দাও যাহাতে কোন কাফেরই বাঁচিয়া থাকিতে না পারে।

হাঁ, ঐ বৃদ্ধই হযরত নূহ (আঃ) যিনি তড়িৎ বেগে নৌকা তৈরী করিতেছিলেন। কখনও কাঠের তক্তা জোড়া লাগাইতেন আবার কখনও উহাতে কাটা মারিতেন মাঝে মাঝে তিনি কাঁদিতেন এবং চোখ মুছিতে মুছিতে একাকী বলিয়া চলিতেন। কি বলিতেন তাহা আমরাও শুনি, আসুন ঃ- "আল্লাহুম্মা আহ্‌ফাজনীবে রহমাতেকা। আল্লাহুম্মা নাজুনি ওয়া আফানী আফে ইয়াতি। আল্লাহুম্মা-মাফ্‌তেহ্‌লী আন ওয়াবে ফাজলেকা বে-অছিলাতে সাহেদিন, বে-অছিলাতে নবী এ কাল আখেরে, বে-আছিলাতে এমামে কাল আউয়ালে এম্‌মে হিল আজম 'এলিয়া' বে আছিলাতে সৈয়াদেতিল্ আলেমীন। বে-অছিলাতে মাহেদিন, বে-আছিলাতে সিব্‌বিল মাছুম তাজাররেহ আনকাহু বের রামা, বে অছিলাতে মোতাহাররাতুল অছুবা লাহা লে রাছেহা, বে-অছিলাতে জামিয়ে মাছুমিনাল

মাজলুমীনাল মোকাদ্দেছীন' [মেরাতুল দাকিক ফি তাহকিকে আতিক, লেখক ঃ এবনে ছেরাজ আল ছাফানী। মুদ্রায়ণ ঃ- বাগদাদ কেতাবুল আজায়েব তাহকিব, লেখক ঃ মোঃ কাদীরুল আলাবী। 'এজাজুল আম্বিয়া', লেখক ঃ ছারমাদি। মুদ্রায়ণ ঃ ইরান, 'কিতাব আছারুল গরবীয়া', লেখক ঃ আবুল ফতেহ জামজানী। 'এখবারুল আছার' মুদ্রায়ণ ঃ মিশর।

হযরত ছোলায়মানের মূল রৌপ্য ফলক

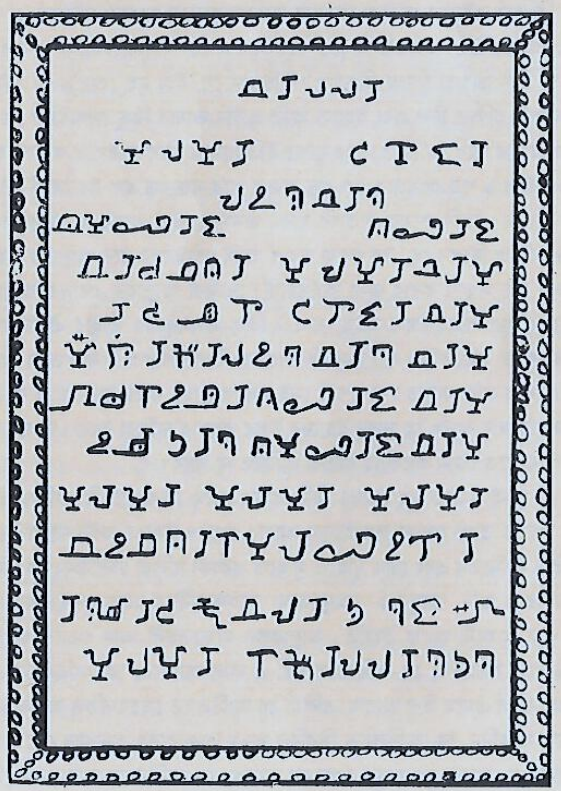

'ছিরাতুল মুরছালীন' লেখক—মোঃ কবীর খাঁন সিরাজী। মুদ্রায়ণ —ইরান]

অনুবাদ ঃ -হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দ্বারা আমাকে বাঁচাইয়া রাখ। হে আল্লাহ! আমাকে শান্তি দাও। আমাকে পরিত্রাণ করো। হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলিয়া দাও। আখেরী নবীর অছিলায়, প্রথম ইমামের অছিলায়, যাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম 'এলিয়া' এবং উভয় জাহানের সরদারের অছিলায়, উভয় শহীদের অছিলায়, ঐ মাছুম শিশুর অছিলায় যাঁহার গলায় তীর বিদ্ধ করিয়া জখম করা হইবে। পবিত্রা বিবির অছিলায় যাঁহার মাথায় কোন কাপড় থাকিবে না। সমস্ত মাছুম এবং অত্যাচারিতের (মজলুম) এবং পাক পবিত্র ব্যক্তিগণের অছিলায়।

তিনি সর্বান্তঃকরণে অত্যন্ত নমনীয় ও বিনয়ের সহিত আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিতেছিলেন। তিনি মুনাজাত করিতেছেন আর কাঁদিতেছেন; কাঁদিতেছেন আর মুনাজাত করিতেছেন। এভাবে নৌকা তৈরী করিতেছেন। জনসাধারণ তাঁহার কাছে আসা যাওয়া করিতেছে এবং নৌকা তৈরী করা দেখিতেছেন আর তাঁহার সংগে হাসি ঠাট্টা করিতেছেন, বিদ্রূপ করিতেছেন। তাহারা বলিতেছে, "দেখ এই বৃদ্ধের অস্বাভাবিক বার্ধক্যের দরুন ভিমরতি হইয়াছে। পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিতেছে ঃ "হে মানুষ সকল ! তওবা করো, মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও, তাহা না হইলে তোমাদের উপর তুফান আসিবে এবং বন্যায় তোমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। " দেখতো! কেমন আহাম্মুকী কথা!! আজ ১২ বৎসর যাবৎ এতটুকু মেঘের কণা পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না! মাটির উপর একফোঁটা বৃষ্টিও পড়িল না অথচ ঐ বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিতেছে যে বন্যা আসিবে, তুফান আসিবে এবং দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা।

নূহ আপন কাজে ব্যস্ত, আপন প্রার্থনায় ব্যস্ত, কাহারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না!

কোন একটি ঘরে চুল্লি জ্বলিতেছে, মেয়েরা রুটি তৈরী করিতেছে এবং হযরত নূহ (আঃ) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে, "বোন ঐ বৃদ্ধ লোকটির কী হইল ! যে মানুষগুলিকে মূর্তি পূজা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছে এবং এক আল্লাহর এবাদতের জন্যে চীৎকার করিতেছে নতুবা সবাই নাকি ডুবিয়া মরিবে!! তুমি কি মনে করো যে আমরা তাঁহার কথা মত আমাদের প্রভুকে বাদ দিব? আমাদের 'ওয়াদ' ও 'ওয়াইওক' (প্রাচীন কালের মূর্তীর নাম কোরান পাকে এ সনম্বন্ধে লিখিত আছে) ইত্যাদিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব!"

এই দুরাচারী ও পথভ্রষ্ট কন্যাদ্বয় হযরত নূহ (আঃ) এর কুৎসা গাইতেছিল ও অট্টহাসিতে কাঁটিয়া পড়িতেছিল। যে মুহূর্তে তাহাদের হাসি থামিয়া গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ চুল্লী ফাটিয়া গেল এবং পানির ধারা বহিতে আরম্ভ করিল। সত্যের দামামা বাজিয়া উঠিল। তুফান। নূহ নবীর কথিত তুফান।। তুফান সমস্ত দুনিয়াকে গ্রাস করিল। সমস্ত সৃষ্টি ডুবিতে আরম্ভ করিল। তখন হযরত নূহ (আঃ) মুনাজাত করিতে ছিলেন ঃ " ইয়া রব্বিওয়া রাববুছছামাওয়াতে ওয়াল আর্দ। ইয়া মোহাম্মদ সৈয়াদুল কাওনায়েন ওয়াছ ছকল্যাণ। ইয়া এলি এমামুদ দারায়েন' এই প্রার্থনা করিয়া নিজের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহনণ করিতেছিলেন। নৌকা অথই জলে ভাসিতে লাগিল। বড় বড় ঢেউ আসিয়া দুনিয়ার পাপীদের ধুয়ে মুছে পরিস্কার করিতে লাগিল আর এই লোমহর্ষক দৃশ্য তিনি অবলোকন করিতে ছিলেন, এমন সময়ই আহ্‌লে বয়াতের সমস্যা উপস্থিত হইল। আল্লাহ ন্যায় বিচারক ! হযরত নূহ (আঃ)- এর সঙ্গে আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছিলেন যে তাঁর আহ্‌লে বায়েতকে বাঁচাইবেন। এমন সময় অথই জলের মধ্য হইতে একটি মানুষের মাথা ভাসিয়া উঠিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, 'হে পিতা আমাকে বাঁচাও ! হঠাৎ পিতৃ প্রেম নূহ (আঃ)-এর মধ্যে জাগিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া তাঁহার ছেলেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আল্লাহর আদেশ এই বলিয়া তাঁহার হাত থামাইয়া দিল, 'হে নূহ, সাবধান ! তাহাকে তুলিও না; সে তোমার অনুসারী নয়। তাহার সারা জীবনই তোমার বিরুদ্ধচারণ করিয়াছে এবং তোমার অনুসারীদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, এখন সে বলিতেছে ঃ 'আমাকে বাঁচাও.' দেখ তোমার আহ্‌লে বয়াত এবং অনুসারীগণ উহারা যাহারা তোমার নৌকায় তোমার সাথেই আছে। তাহারা তোমার অনুসরণ করিতেছে এবং শুরু থেকেই তোমার সেবা-যত্ন করিতেছিল।'

যাহারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)- এর আহ্‌লে বায়েত কে স্বীকার করে না তাঁহাদের মর্য্যাদার চোখে দেখে না বরং সে সম্বন্ধে তর্ক করে যে, অমুক অমুক লোক রাছুলুল্লাহর আত্মীয় স্বজন ছিলেন তাদের কেন আহলে বয়াতের সঙ্গে গণনা করা হয় না ! ইহার উত্তর তাহাদের নিজেদেরকেই চিন্তা করা উচিত যে রছুলের 'জিলকোরব

(আহলে বয়াত) হইবার জন্য একটি বিশেষ শর্ত ঃ 'ইয়া তাহররাকুম তাতহীরা' যাহা নাছারা-এ বনি নজরানদের (নজরানের নাছারাগণের সাথে মোবাহেলার সময় উহা সামাধা হইয়াছে) সাথে মোবাহেলার সময় সমাধা হইয়াছে। এখন অন্য ব্যক্তিকে আহ্‌লে বায়েতদের মধ্যে টানিয়া আনার সুযোগ নাই। রছুলে করীম নিজে বলিয়াছেন, 'মছালা আহ্‌লে বয়াতী কমসালা সাফিনাতুন নূহ মান দাখালাহা ফানাজ্‌জী।' অর্থাৎ

আমার আহ্‌লে বয়াত হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকার মত যাহারা ইহার ভিতরে চলিয়া আসিবে এবংসত্যের সাথী হইবে কেবল তাঁহারাই মুক্তি পাইবে।

হযরত নূহের নৌকা দুনিয়া ও দুনিয়ার পাপীদের ধ্বংসের বীভৎস দৃশ্য অবলোকন করিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌছিল। তৎপর আল্লাহর নবী নিজের অনুসারীদের সঙ্গে লইয়া জাহাজ হইতে বাহির হইয়া আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করিলেন ঃ " হে প্রভু আমি তোমার অসংখ্য প্রসংশা ও গুণ-কীর্তন করিতেছি। হে আল্লাহ তোমার দরবারে অগণিত শোকর, তুমি আমাকে কঠিন আজাব হইতে রক্ষা করিয়াছ এবং তোমার রাছুল 'আহম্মদ'-এর শোকর আদায় করিতেছি। ঐ 'এলিয়ার' শোকর আদায় করিতেছি যে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। ঐ 'এলিয়া' যে তোমার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিবে এবং তোমার প্রিয় নবীর পবিত্র কন্যারও শোকর আদায় করিতেছি, তাঁর উভয় সন্তানদের শোকর আদায় করিতেছি, যাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।'

নূহের ঘটনা হাজার হাজার বৎসর পূর্বে সংগঠিত হইয়াছিল। কেহই জানে না যে হযরত নূহের নৌকা কোথায় আসিয়াছিল। 'কাফ' অথবা 'জুদি' পাহাড় কোথায় ! কিন্তু আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, নিজের প্রিয় নবীকে এবং তাঁর আলে মোহাম্মদ (দঃ)-এর পাক পবিত্র নামকে সব সময় সমুন্নত রাখিবে এবং তাঁদের 'জেকের' যে কোন অবস্থায় মানুষের মুখে থাকিবে। সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এমনিভাবে পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করিয়াছেন যে পাক পাঞ্জাতনের নাম বিশ্বের বুকে অত্যন্ত মর্য্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ঐদেশে যে দেশের লোকগুলি আল্লাহকে মানে না।

হাঁ, রাশিয়াতে যে নূতন অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছিল সে সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিতেছিলাম। মাটির নীচে প্রাপ্ত ঐ কাঠগুলি যখন প্রমাণিত হইল যে উহা নূহ (আঃ)-এর নৌকার, তখন তাহাদের আগ্রহ ঐ ফলক সম্বন্ধে আরো বাড়িয়া গেল এবং ফলকে কি লেখা আছে তাহা জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া গেল। তখন রাশিয়ান সরকারের অধীনে প্রাচীন ভাষাবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইল, ঐ ফলকে কি লেখা আছে তাহা উদ্ধার করার জন্য। নিম্ন লিখিত ভাষাবিদদের সমন্বয়ে উক্ত কমিটি ১৮৫৩ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী এই গবেষণার কার্য্য শুরু হয় ঃ- (১) প্রফেসর ছোলেন্‌ফ, মস্কো ইউনিভার্সিটি। (২) প্রফেসর ইফাহান খেনু, লুলুহান কলেজ, চীন। (৩) মিশানেনলু ফরেং, অফিসার-ইন চার্জ, কঙ্কাল। (৪) তমল গরফ, শিক্ষক ক্যাবজার্ড কলেজ। (৫) প্রফেসর ডিপাকান, লেলিন ইনিস্টিটিউট। (৬) এম, আহম্মদ কোলাড, জিটকোমেন রিসার্স এ্যাসোসিয়েন। (৭) মেজর কট লোফ, ষ্টালিন কলেজ।

উপরোক্ত ৭ জন গবেষক দীর্ঘ ৮ মাস যাবৎ গবেষণা করার পরে তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌছিল যে ঐ ফলকটি হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ তৈরীর সময় ব্যবহার করিয়াছিলেন উহা তাহার জাহাজে রক্ষণ করিয়াছিলেন; যাহাতে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হইয়া নৌকা ও ইহার আরোহীগণ নিরাপদে অবস্থান করিতে পারেন।

ফলকটির মাঝখানে পাঞ্জার মত ছবি খোদাই করা এবং ছামানী ভাষায় লেখা। ইহা নিম্নরূপ ঃ

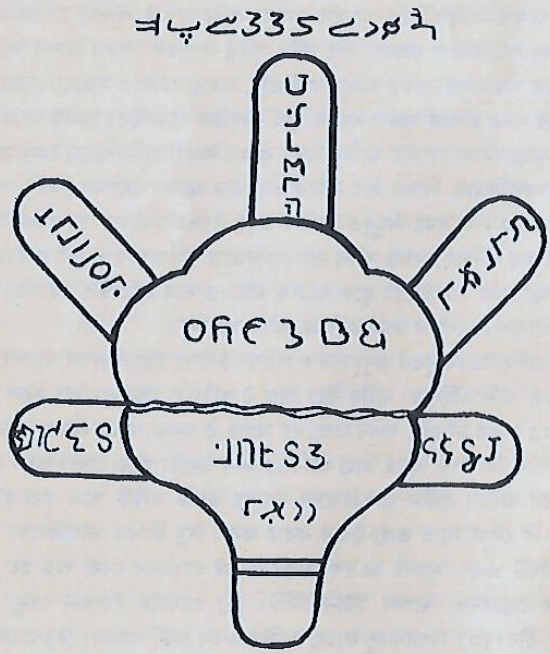

ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রাচীন ভাষার গবেষক মিঃ এন, এফ, ম্যাক্স ঐ ফলকের লেখার ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, যাহার মূল লেখাও বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ-

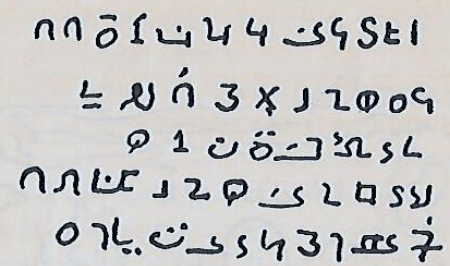

হে আমার প্রভু, আমার সাহায্যকারী। আমার হাত করুণা ও রহমতের সঙ্গে ধর, তোমার পাক পবিত্র প্রিয় বান্দাদের অছিলায়।

মোহাম্মদ
এলিয়া
সাব্বার (ইমাম হাসান (আঃ))
সাব্বির (ইমাম হোসেন (আঃ))
ফাতেমা

যাহারা স্বয়ম্ভূ ও সম্মানী
বিশ্ব চরাচর তাঁহাদের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে।
তাঁহাদের নামের উছিলায় আমাকে সাহায্য কর।
সরল পথে চালাবার একমাত্র মালিক তুমিই।

জনসাধারণ উক্ত লেখা পড়িয়া অবাক হইয়াছে। অবাক হওয়ার মূল কারণ হইল হাজার হাজার বৎসর পরেও উহা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছে। বরং একই অবস্থায় আছে। ঐ ফলকটি আজও রাশিয়ার মস্কোতে প্রাচীন ফসিল গবেষণা কেন্দ্রে রক্ষিত আছে।

হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকার মূল ফলক

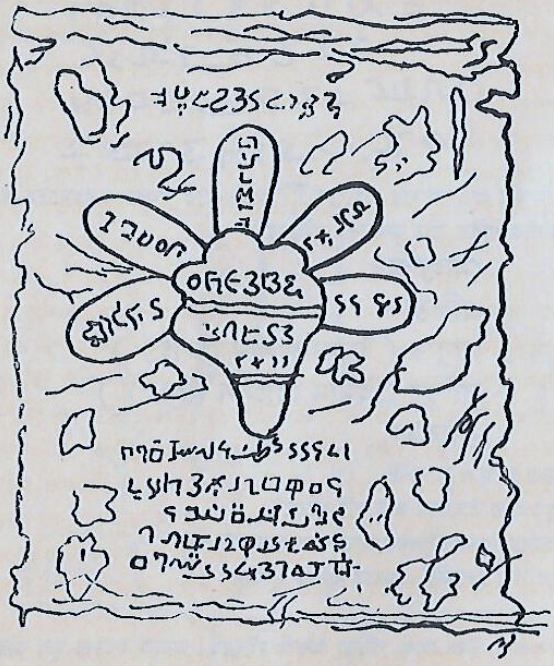

[মাসিক পত্রিকা ষ্টোরী অব ব্রিটেনিয়া জানুয়ারী ১৯৫৪ ইং লণ্ডন। দৈনিক পত্রিকা 'সানলাইট' ম্যাঞ্চেষ্টার, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৩ ইং এবংসাপ্তাহিক 'মিরর', লণ্ডন ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ ইং]

মহাত্ম বুদ্ধের পরিচয়ের জন্য কোন ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। তবুও অতি সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। তিনি ছিলেন রাজকুমার। তাঁহার বাল্যকাল ও সাধনা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিভিন্ন বই পুস্তকে বিদ্যমান। এ সমস্ত বিখ্যাত ঘটনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনা অন্যতম ঃ-

জোতিষীগণ বুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার পিতার নিকট ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসে এক কুমার জন্ম গ্রহণ করিবে কিন্তু সে জঙ্গলে বাস করিবে। রাজ সিংহাসন অর্থাৎ ইহজগতের সমস্ত লোভ-লালসা ত্যাগ করিবে। অতএব রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজ প্রাসাদের মধ্যেই শিক্ষা-দীক্ষা ও যাবতীয় ব্যবস্থাদি করা হয়, যেন কোন অবস্থাতে তিনি রাজ প্রাসাদের বাহিরে আসিতে না পারেন। অতঃপর বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং জ্যোতিষের বাণী অনুযায়ী রাজ প্রাসাদের মধ্যেই সকল ব্যবস্থা করা হইল এবং একজন বিখ্যাত রাজ শিক্ষকের অধীনে লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করা হইল।

বুদ্ধ বড় হইলে পর যথা রীতি তাঁর বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা হইল। কিন্তু তখনও তাহাকে কড়া পাহারার মধ্যে রাজ প্রাসাদে রাখা হইল যাহাতে বহির্জগৎ দর্শন না হয়। অবশেষে কোন এক শুভদিনে পিতার আজ্ঞা লইয়া তাঁর শিক্ষাগুরুর সঙ্গে প্রাসাদের বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া প্রথমেই নজরে পড়িল যে এক বৃদ্ধ লাঠি ভর করিয়া হাঁটিতেছেন। বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাঁহার গুরুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে প্রত্যেক মানুষ শিশু হইতে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং তার সঙ্গে দৈহিক শক্তি হ্রাস পাইতে পাইতে শেষ পর্যন্ত লাঠি ভর করিয়া তাহাকে হাঁটিতে হয়। একটা রোগী ব্যথায় চীৎকার করিতেছে দেখিয়া গুরুর নিকট পূর্ববৎ কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরু বলিলেন যে, প্রত্যেক মানুষই তাহার জীবনে কোন না কোন সময় রোগগ্রস্ত হয়। আরো কতদূর অগ্রসর হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন একদল লোক কান্নাকাটি করিতেছে এবং ১টি মৃতদেহ সৎকার করিতেছে। পূর্ববৎ বুদ্ধ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিক্ষা গুরু বলিলেন যে প্রত্যেক মানুষকেই তার আয়ু শেষে মৃত্যু বরণ করিতে হয়। সুতরাং ঐ ব্যক্তিও চিরাচরিত নিয়মে মৃত্যু বরণ করিয়াছে এবং তাহার মৃত দেহ সৎকার করিতেছে।

কতগুলি দুঃখজনক ঘটনা দর্শন করিলে পরে বুদ্ধের মনে এক নব চেতনার উদ্ভব হয়। ঐ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বুদ্ধ পার্থিব জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষার তাঁর মন হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায় অতঃপর তিনি জঙ্গলে চলিয়া গেলেন।

গৌতম বুদ্ধের উপরোক্ত ঘটনাবলী নিরপেক্ষ যুক্তি প্রমাণের দর্শনে বিচার করিলে দেখা যায় যে উহা সমস্তই রূপকথার মতই বানোয়াটি। বুদ্ধ তার পিতার একান্ত বাধ্য সন্তান ছিলেন। যদিও তাঁহার পিতা জ্যোতিষীগণের ভবিষ্যৎবাণীর উপর বিশ্বাস করিয়া

তাঁহাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তবুও তাঁর গৃহবন্দীর ২০ বৎসরে একবারও যে রোগ, শোক, বার্ধক্য অথবা মৃত্যু দর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, ইহা একেবারেই অবাস্তব। তাছাড়া ২০ বৎসরে এমন কী শিক্ষাই বা দিয়াছিলেন যাহাতে ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মোটেই অভিজ্ঞতা হইল না!!

অতএব আমরা যদি বাস্তবিকই মূল সত্য জানিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে হয়তো আমাদের কথা বিশ্বাস করিবে না। সেই জন্যই আমরা এখানে একজন বুদ্ধ-বিদ্যায় জ্ঞানী শাস্ত্রীর লেখা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম। (মিঃ এল, কে, ভট্টনাগর এম, এ, আই, ই, এস,—বুদ্ধ চমৎকার—মুদ্রণে ঃ উন্‌কার পুস্তকালয়, কানপুর, ভারত—১৯২৭ খৃঃ) 'অহিংসা, ত্যাগী বেদান্ত, আআর শুদ্ধতা দর্শন শাস্ত্র এবং গৌতম বুদ্ধের অন্যান্য আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক ঘটনা যাহা প্রচারের মূলমন্ত্র ও একমাত্র ভিত্ তার ধর্মীয় গ্রন্থে শুধু এই কারণেই পাওয়া যায় যে, যখন বুদ্ধ রাজমহলে ঘুমাইতেছিলেন তখন হঠাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনে হয় তিনি দুঃখ ও ব্যথায় জর্জরিত। তাঁহার পাশে শায়িত ছিলেন তাঁহার শিক্ষা গুরু তিনিই তাঁহার চীৎকার ও কান্না শুনিয়া উঠিয়া বসিলনে এবং বুদ্ধের পিঠে হাত বুলাইয়া সান্তনা দিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কী হইয়াছে রাজকুমার? আপনি কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন কী? আপনি কি ভয় করিতেছেন?' রাজ কুমার ধীর শান্ত ও গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, কিছুই না গুরুজী। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি; কিন্তু আসলে উহা স্বপ্নে নয় অন্য জিনিস। অন্য জিনিস। গুরুজী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করার পরে বুদ্ধ বলিলেন, 'গুরুজী। আপনি জানেন যে আমি ধর্মীয় পুস্তকগুলি অতি আগ্রহের সাথে পড়িয়া থাকি। আপনি আরো জানেন যে আমি ঈশ্বরের পূজায় আগ্রহী এবং তার মহিমা দেখার জন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াই। কিন্তু আজ যে ঘটনা ঘটিল তাহা সম্বন্ধে দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন না। কোন মহাআ আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, তোমার তপস্যা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। যাও এবং আমার নাম স্মরণ করো। অবশ্যই তোমার আরাধ্য বস্তু পাইবে। আমার নাম 'আলীয়া' তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, আমার বাসস্থান পবিত্র ফাটা দেয়ালের নিকট। যেখানে তুমি আমাকে বালক অবস্থায় পাইবে। কিন্তু যে যুগ অনেক দূরে।'

বুদ্ধের উপরোক্ত স্বপ্নের তাৎপর্য সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। বুদ্ধের পরামাআ তাঁর নিজের নাম এবং জন্ম স্থান বলিয়া দিয়াছেন। 'আলীয়া' অথবা আলী ইব্রানী ভাষায় 'এলিয়া' অথবা 'এলির'ই রূপান্তর হযরত আলী (আঃ) খানে কাবাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বপ্নের পরবর্তী অংশ বুদ্ধ তাঁর শিক্ষা গুরুর নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, 'গুরুজী, এই বলার পরে তিনি তাঁহার তরবারী উত্তোলন করিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিলেন,' দেখ, আমি একটি সিংহ। ঈশ্বর আমাকে সিংহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। যাও, এই পৃথিবীকে পাপ ও অন্যায় হইতে বাঁচাও। আআর রোগ তাড়াইয়া আআ শুদ্ধ কর। তোমার ভাগ্য নিশ্চিত হইবে। আমার প্রভু আসিতেছেন, তাঁহাকে মান্য করিও এবং আমার প্রভুর প্রভুকে মান্য করিও। এবং শিষ্য করিয়া পাঠাইলাম, প্রতারিত হইও না। যাও, আপদে-বিপদে আমার নাম স্মরণ করিও, অবশ্যই আমি উপস্থিত হইব।'

উপরোল্লিখিত বুদ্ধের স্বপ্নের বাকী অংশ বিবেচনা যোগ্য। এখানে 'আলিয়া' 'এলি' বা 'আলী' তাঁহার তলোয়ার (জ্বলফিকার) দেখাইতেছেন এবং তিনি নিজেকে সিংহ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। যাহা আছাদুল্লাহীল গালিব্ অথবা শেরে খোদার সমান। হযরত আলী (আঃ) ছাড়া কেহই আল্লাহর সিংহ বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত নয়।

'আমার প্রভু আসিবে। তাঁহাকে মান্য করিও এবং আমার প্রভুর প্রভুকে মান্য করিও।' এই বাক্যে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আগমনের ঈঙ্গিত বহন করিতেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, গৌতম বুদ্ধ শাক্যমুনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, 'শাক্য' 'শাকী' শব্দের তুল্য এবং আলী (আঃ) 'শাকী এ কাওছার' বলিয়া পরিচিত। অতএব শাক্যমুনী অর্থাৎ শাকীএ কাওছারের মনোনীত প্রদর্শক বা সংস্কারক শাক্যমুনী।

এক বিরাট জনগোষ্ঠী বুদ্ধের বিরোধী ছিল। তাই তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তিনি দুনিয়া ত্যাগ করিলেন। তাঁহার উপর কোন আপদ-বিপদ আসিলে তিনি নিম্ন বর্ণিত প্রার্থনা করিতেন :

'হে তোমার প্রিয়গণের প্রিয়। হে এলিয়া। হে সর্ব জয়ী, আমাকে তোমার মহিমা প্রদর্শন কর, তোমার রহমতের হাত আমার প্রতি প্রসারিত কর। হে ঈশ্বরের সিংহ, এই দুনিয়ার শিয়ালগুলি আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টায় ব্যাপৃত। তাঁহারই কছম, যাঁহার হাত ও বাহু তুমি, তাঁহারই কছম, যাঁহার শক্তি তোমার মধ্যে বিদ্যমান, আমাকে সাহায্য কর। তুমি ওয়াদা করিয়াছ যে আপদে-বিপদে আমাকে সাহায্য করিবে। অতএব এখনই সাহায্য করার উপযুক্ত সময়। শীঘ্র আস, নতুবা আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। তোমার শপথ, ঈশ্বরের শপথ, এসো, যেহেতু তোমার দর্শন হাজার প্রার্থনার সমতুল্য। তুমি আল্লাহর চেহারা, হে আমার প্রিয়, তুমিই সবকিছু। তোমা বিহীন আমি কিছুই না। তুমি সবকিছুই দেখিতেছ, সব ঘটনাই তোমার জানা। তুমি আমার দুঃখ জানো। তুমিই ত্রাণ কর্তা। আলিয়া, ঔ আলীয়া।' উপরোক্ত প্রার্থনা যুক্তিতর্ক ও সমালোচনার উর্দ্ধে,

যেহেতু উহা 'বুদ্ধ জ্ঞান' নামক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল লেখক রামনারায়ণ বনবাসী ১৯৩১ খৃঃ পৃ নং ৫৭]

উপরোক্ত স্বপ্ন ব্যতীত গৌতম বুদ্ধ তাঁহার মৃত্যুর সময় শিষ্যগণকে 'আলীয়' বা আলী (আঃ)–এর শুভাগমনের ভবিষৎবাণী করিয়াছিলেন। পাক পাঞ্জাতন ও কারবালার নৃশংস ঘটনার ও ভাবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, তাঁহার শয্যার পাশে উপবিষ্ট অন্যতম শিষ্য শ্রী আনন্দ গুরুর অন্তিম কাল সমাসন্ন দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। তখন বুদ্ধ শিষ্যের এই করুণ অবস্থা দেখিয়া মৃদু হাসিয়া তাহাকে সান্তনা দিয়া বলিলেন, "প্রিয় ভক্ত আনন্দ দুঃখিত হইও না, কাঁদিও না। আমি তোমাকে পূর্বেও বলিয়াছি যে, নিজের প্রিয় ও পরম প্রত্যাশিত বস্তু ছাড়িয়া বরং দুনিয়ার সমস্ত বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই ভবজগৎ ছাড়িয়া যাইতে হয় এবং ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। অতএব আমি যাইতেছি এটা কোন নূতন কথা নয়। আনন্দ বলিলেন, মহারাজ, আপনার পরে আমাদের কে গুরু হইবে এবং কে আমাদেরকে শিক্ষা দিবে? তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, "আনন্দ, স্মরণ রাখ, এই দুনিয়াতে শুধু আমিই নই। যখন সময় আসিবে তখন আরো একজন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিবেন যিনি আল্লাহর নূর হইবেন আর তিনি অত্যন্ত পাক পবিত্র হইবেন। আল্লাহর জ্ঞানের বড় অংশ তিনিই পাইবেন, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান হইবেন। সৃষ্টির সমস্ত গুপ্ত তত্ত্ব তিনি জানিবেন। মনুষ্য সমাজের শ্রেষ্ঠতম সত্য পথ প্রদর্শক। মানুষ ও জ্বীনদের শিক্ষক। তিনিই তোমাকে ঐ সব মূল সত্যের শিক্ষা দিবেন। যাহা আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছি। তিনি ধর্মের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকিবেন, ঐ দীনই সর্বোত্তম হইবে। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ধৈর্য্য ও সাহসের জন্য তিনি অত্যন্ত সমাদৃত হইবেন এবং ছাহেবে জামাল ও জালাল হইবেন। তাঁহার শিক্ষাই জীবনের আআ এবং ঐ শিক্ষাই পরিপূর্ণ, পাক পবিত্র এবং নিষ্কলুষ। যদি আমার শিষ্যের সংখ্যা শত শত হয় তবে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা হইবে হাজার হাজার। তিনি 'মিতিরিয়ার' পবিত্র নামে বিখ্যাত হইবেন।" [দেখুন —বই 'বুদ্ধ প্রকাশ', লেখক–দেবশাশ্রী লালাহার গবিন্দ আহলু জিয়া। মুদ্রায়ণ : সরস্বতী প্রেস, বোম্বে।] ১৯৯১ খৃঃ

ভক্ত আনন্দ 'মিতিরিয়া' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন পর বুদ্ধ বলিলেন, "হে আনন্দ 'মিতিরিয়া' ঐ ব্যক্তি যিনি সমস্ত মুনী ঋষীর ছিলছিলা পূর্ণ করিবেন। তাঁহার মাথায় পাঁচ কোণ বিশিষ্ট একটি মুকুট থাকিবে। যাহা সূর্য ও চন্দ্রের মত ঝলমল্ করিবে। ঐ মুকুটের সবচেয়ে বড় হীরার টুকরার নাম 'আলীয়া' হইবে। —[নোট :– মহারাজা রামচন্দ্র ও অযোদ্ধার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, সে রাজার রাজা নিজের নূরে প্রকাশিত হইবে এবং যাঁহার অসংখ্য শিষ্য হইবে। তাঁহার মাথায় পাঁচ কোণা বিশিষ্ট একটি মুকুট থাকিবে

তার চেয়ে বড় কোণটির নাম 'আহলীয়' অথবা 'এলিয়া' হইবে।] [দেখুন 'অযোদ্ধাকা বনবাসী', লেখক শংকর দাশ। মুদ্রায়ন : আগ্রা ১৯২৩ ইং]

"স্মরণ রাখ , এই পাক পবিত্র দেহগুলি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ তার সর্বশেষে। অত্যাচারীগণ তাঁহার মুকুটের কোণাগুলির ভীষণ ক্ষতি করিবে এবং ক্ষতি করার যে কোন প্রকারের পন্থা অবলম্বনে তিল মাত্র ত্রুটি করিবে না। কিন্তু মালিক (প্রভু) তাঁহাদের নাম, রীতিনীতি সম্মান দুনিয়ার শেষ অবধি বাঁচাইয়া রাখিবেন। আনন্দ! তোমার আমার মত কোটি কোটি মানুষ তাঁহার অপেক্ষায় জীবনাতিপাত করিবে। কিন্তু সৌভাগ্য তাহারই যাহারা তাঁহারই পাক পবিত্র সাহচর্যে থাকিতে পারিবে। এখন এর বেশী আর কিছুই বলিতে পারিব না।'

গৌতম বুদ্ধের উপরোক্ত বক্তব্যে হুজুর (দঃ) সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন এমন কি হুজুর (দঃ)–এর কোরাণী ও রহমানী খেতাব পর্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন। 'মিতিরিয়া' সংস্কৃত ভাষা যাহার অর্থ অত্যন্ত করুণাময় ও রহমত ওয়ালা। ওয়ামা আরছাল নাকো ইল্লা রহমাতুল্লিল আল্ আমীন— এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহপাক দুনিয়ার কোন নবী রছুলকে 'রহমত' 'রহমতে আলম' অথবা 'রহমাতুল্লীল আল আমীন' খেতাবে ভূষিত করেন নাই, একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ছাড়া। বুদ্ধদেব হুজুর (দঃ) কে 'মিতিরিয়া' বলিয়া তাঁহার মস্তবড় ফজিলাত বর্ণনা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব তাঁহার শেষের দিকে বলিয়াছেন যে তিনি (হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সমস্ত নবী ও রসুলদের শেষে আগমন করিবেন এবং তাঁহার মাথার উপরে পাঁচ কোনা বিশিষ্ট একটি মুকুট থাকিবে। পাঁচ কোনার অর্থ পাক–পাঞ্জাতন। ইহও বলিয়াছেন যে চাঁদ ও সূর্য্যের মত আলো চমকাইবে। হুযুর করীম (দঃ)–এর হাদিসে বর্ণিতে আছে, "আনা কাল সামছ ওয়া আলী কাল কমর"—অর্থাৎ আমি সূর্যের ন্যায় এবং আলী চন্দ্রের ন্যায়। 'আল কমর' আলীকে হীরার সঙ্গে তুলনা করিয়া আবার তাঁহার নাম 'আলীয়া', 'এলিয়া' বলিয়াছেন।

তিনি আরো বলিয়াছেন যে তাহার সন্তানদের উপর অত্যন্ত যুলুম করা হইবে। এবং তাঁহাদের নাম–নিশানা পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবে। কিন্তু আল্লাহর 'এলিয়ার' নামকাম এবং পাক পবিত্র বংশধরকে কেয়ামত পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিবেন।

তাঁহার বর্ণনার শেষের দিকে বলিয়াছেন যে সৌভাগ্য তাহাদেরই যাহারা তাঁহার সাহায্য লাভ করিবে।

অতএব এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে নবী করীম (দঃ) এবং হযরত আলীর পাক–পবিত্র সঙ্গী কাহারা?

পরিশিষ্ট—নং ১

বাইবেলে আহলুল বায়াতের বর্ণনা

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীনতম ধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী হযরত মোহম্মদ (দঃ)–এর আর্বিভাবের এবং তাঁহার গুণাবলীর পূর্বাভাস আছে। শুধু তাই নয় তাহার আহ্‌লে বয়াতের গুণাবলী ও ফজিলাত সম্বন্ধেও উল্লেখিত আছে। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র বাইবেলে আহ্‌লে বয়াতের পরিচয়ের প্রথমেই হযরত ঈসা নবীর পবিত্র বাইবেলে লেখা ঃ

" I say unto you the truth that none who doeth not accept the kingdom of God like (the) child shall enter it" [Mirqas-10 : 15]

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে সে কোন মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না (মার্ক–১০ : ১৫)।

যদি কেহ চিন্তা করে তবে পরিষ্কারভাবেই বুঝিতে পারিবে যে ঐ ছেলেটি কে যিনি কিশোর থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং পরবর্তীতে তিনি আল্লাহর মহত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, ও স্বীকার করিয়াছেন এবং বিনা দ্বিধায় একাঅতা ঘোষণা করিয়াছেন। নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার নবুয়াতকে স্বীকার করিয়াছেন, যখন কেহই উহা স্বীকার করিতে সম্মত ছিল না। নিঃসন্দেহে তিনি হযরত আবু তালিবের পুত্র হযরত আলী (আঃ)। তিনিই বিনা দ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে এবং প্রশান্ত চিত্তে বিশাল জনতাকে উপেক্ষা করিয়া হুযুর (দঃ)–কে নবী স্বীকার করিয়া লইয়া উপস্থিত জনতাকে হতভম্ব করিয়াছিলেন। হুযুর (দঃ)–এর বাণী শোনার জন্য যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কিশোর আলীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রছুল করীম (দঃ) নবুয়াতের সাক্ষী দিয়াছেন।

যিশুখৃষ্ট হযরত আলীকে শিশু হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এই কারণে যে শিশু যেমন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ (মাছুম) তেমনই আলী (আঃ) নিষ্পাপ এবং এমন একজন মাছুমই আর একজন মাছুমকে (তাহার ভাইকে) নবুয়াত প্রাপ্তির সাক্ষী দিয়াছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানই রছলে করীম (দঃ) এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়া বলে যে, "রছুল পাক (দঃ)–এর প্রত্যেক ছাহাবাগণ এক একটি তারার মত"। কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই ছাহাবাগণকে আহ্‌লে বয়াতের সঙ্গে ধর্মের জ্ঞান, মান ও সম্ভ্রমের এই পর্য্যায়ে অর্থাৎ সমমানের দণ্ডে ফেলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, যদিও উপরোক্ত হাদিস যুক্তি প্রামাণিক নয়। সুতরাং ইসলামের উচ্চ পর্য্যায়ের আলেমগণ এখানে একমত পোষণ করেন না। অবশ্য যদিও তর্কের খাতিরে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবুও ইহার মধ্যে অনেক তাৎপর্য্য ও তাত্ত্বিক জ্ঞান নিহিত আছে। যেমন রছুলের ছাহাবাগণ সকলেই তারার মত বটে, কিন্তু সব তারার আলোই সমমানের নয়। কতক তারার বেশ আলো আছে, কতক অবার অচিরেই নিভিয়া যায়, আবার কিছু সংখ্যক এমনও আছে যাহা ভোর হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট আলো নিয়া একই অবস্থায় থাকে, কোন রকমের ইহাদের পরিবর্তন হয় না। এ সম্বন্ধে শুধু আমাদেরই বক্তব্য নয়। যিশুখৃষ্ট নিজেই উহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তিনি বলেন, " Some of the bodies are heavenly, some of them belong to the earth. The rank and dignity of the heavenly bodies is different from that of the earthly bodies. Even the rank and dignity of the heavenly bodies varies from bodies to bodies. The dignity of the sun is different from that of the moon and so on and so forth. (Caranthewue-15 : 40-41)

বঙ্গানুবাদ ঃ আর স্বর্গীয় দেহ আছে আর পার্থিব দেহ আছে; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলির এক প্রকার তেজ ও পার্থিব দেহগুলির অন্য প্রকার। সূর্য্যের এক প্রকার তেজ, চন্দ্রের এক প্রকার তেজ। কারণ তেজ সম্বন্ধে একটি নক্ষত্র হইতে অপরটি ভিন্ন।

উপরোক্ত বর্ণনায় হযরত ঈষা (আঃ) হযরত মুহম্মদ (দঃ) কে সূর্য্যের সাথে তুলনা করিয়াছেন এবং হযরত আলী (আঃ) কে চন্দ্রের সহিত এবং আহলে বয়েতদের তারকার সাথে তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ঐ তারকাগুলি সমমানের নয়। একের সাথে অপরের মিল নাই। তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও মানের দিক হইতে অনেক পার্থক্য আছে। অতএব তাহাদেরকে একই মানে দেখা যুক্তি সংগত নয়। উপরোক্ত বর্ণনায় স্বর্গীয় ও মর্ত্যীয় মানুষ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে মূল রহস্য উদঘাটিত হইবে। অর্থাৎ এক দেহ হইতে অন্য দেহ আকাশ পাতাল পার্থক্য বুঝাইয়াছেন।

উপরোক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে নিম্ন লিখিত বাইবেলের শ্লোক কয়টি উল্লেখ যোগ্য :

The first human being i.e. Adham become a living soul. But the last one become the life bestowing soul, But the first one was at first temoporal and then become spiritual, the first is from earth but the last is from heaven. As he was earthly others also belong to the earth and as he is heavenly some others are also heavenly. As we have taken shape of the earthly one we shall take shape of that heavenly also." [The first letter of polis, Addresed to Caranthewue, 15,45-49}

বঙ্গানুবাদ ঃ- এইরূপ লেখাও আছে প্রথম 'মানুষ' আদম সজীব প্রাণী হইল, অবশেষে আদম জীবনদায়ক আত্মা হইলেন। কিন্তু যাহা আত্মিক তাহা প্রথম নয় বরং যাহা প্রাণীক তাহাই প্রথম; যাহা আত্মিক তাহা পশ্চাৎ। প্রথম মানুষ মৃত্তিকা হইতে, মৃন্ময় দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ হইতে। মৃন্ময় ব্যক্তিরা সেই মৃন্ময়ের তুল্য এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা সেই স্বর্গীয়ের তুল্য। আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করিয়াছি, তেমনি সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্তি ও ধারণ করিব।' (১৫ : ৪৫-৪৯)

উপরোক্ত বর্ণনায় মাটির সৃষ্টি ও নূরের সৃষ্টি অর্থাৎ মাটির মানুষ ও স্বর্গীয় মানুষ এই উভয়ের সমন্বয়ে যাহা সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে মাটির সৃষ্টি এবং স্বর্গীয় সৃষ্টি যাহা আল্লাহ্ নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সমান নয় এবং কোন অবস্থায় সমান হইতে পারে না। ইহার স্বপক্ষে পবিত্র বাইবেল আরও ঘোষণা করে ঃ 'Blessed are those who are Weak by heart, because the kingdom of the heaven is theirs". ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। ' Blessed are those who are said, because they shall get consolation'. ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।

"Blessed are those who are forbecaring because they shall inherit the earth' ধন্য, যাহারা ধৈর্য্যশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে।

" Blessed are those who aspire for uprightness because they shall be satisfied'—ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।

"Blessed are those who are kind hearted, because they shall get kindness and mercey'—ধন্য, যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে।

" Blessed are those who are purehearted, because they shall have a view of God' —ধন্য, যাহারা নির্মলান্তকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

" Blessed are those who are peacemakers, because they shall be called the sons of God'--ধন্য, যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত হইবে।

" Blessed are those who were oppressed, because of the heaven is their '--Meti (5 : 3. 10)--ধন্য, যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই—(মথিঃ ৫ : ৩-১০)

উপরোক্ত বাইবেলের বাণীতে একমাত্র আহ্লে বয়াতদের পুণ্য ও গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যাহার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আহ্লে বয়াত অর্থাৎ হযরত আলী (আঃ) -এর বংশধর। নিরপেক্ষ ভাবধারা নিয়া পবিত্র কোরআন অনুশীলন করিলে অবশ্যই আহ্লে বয়াতের গুণাবলী ও তাৎপর্য বোঝা যাইবে। পবিত্র কোরানে বর্ণিত আছে যে আহ্লে বয়াত রসুলে করীম (দঃ) এর অত্যন্ত প্রিয় ও নিকটবর্তী। তাঁহাদেরকে ভালবাসার মূলই ইসলাম এবং শত্রুতা করাই কুফর।

রছুল করীম (দঃ)-এর কলেমা পড়া মোসলমান, তাহাদের ধর্মের উৎকর্ষতা, দৃঢ়তা, বিশ্বাস, উচ্চ মর্যাদা ও ইমান মজবুত করিতে চাহিলে অবশ্যই তাহারা প্রাণপ্রিয় পাক-পাঞ্জাতনের এবং তাঁহার আল্ এর খেদমত করিতে হইবে এবং ভালবাসিতে হইবে। নবুয়তির মূল্য মর্যাদা দিয়া মমিনদের সামিল হইতে হইবে]।[বাইবেলের ৫ম অধ্যায় মথি উদ্ধৃত, ফাদার ফাসটুন ইটালীর প্রখ্যাত পাদ্রী আহ্লে বয়াতের শানে লিখিয়াছেন]

ভগবত গীতায় আহ্‌লে বয়াতের
প্রশংসা

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ডাকিয়া অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াইতে বলিলেন, এ ব্যাপারে আরো নানাবিধ পরামর্শ দিলেন। আহ্‌লে বয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাঁহাদের প্রসংশা করিলেন ও তাঁহাদের পায়রবী করিতে বলিলেন। তৎপর আহ্‌লে বয়াতের নিম্নরূপ পরিচয় দিলেন :

(১) ধর্মের ব্যাপারে তাঁহারা কখনও আমিত্বের মূল্য দেন নাই।
(২) সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়াও নিজের প্রশংসা ও গৌরব করেন নাই।
(৩) কাহারো প্রতি তাঁহারা কঠোর নন এবং কাহারও স্বার্থের অন্তরায় নন।
(৪) যখন কেহ তাঁহাদের ক্ষতি করিত তখনও তাঁহারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই বরং ক্ষমা করিয়া দেন।
(৫) দেখিতে তাঁহারা যেমন কর্মেও তেমন। তাদের আত্মা অমায়িক ও অসীম ধৈর্য্যের অধিকারী।
(৬) তাঁহারা পবিত্র, চিরদিন পবিত্র থাকিবেন এবং অন্য সবাইকে পবিত্র করিবেন।
(৭) তাঁহারা এই দুনিয়াতে থাকেন কিন্তু দুনিয়ার চাহিদা হইতে তাঁহারা সর্বদা মুক্ত।
(৮) তাঁহারা সর্বদা সঠিক ও সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।
(৯) তাঁহারা তাঁহাদের নফস্‌কে সীমার বাইরে যাইতে দেন না।
(১০) তাঁহারা কোন ব্যাপারেই গর্বিত নন।
(১১) মৃত্যু এবং পরকাল সম্বন্ধে তাঁহারা সর্বদা সচেতন।
(১২) তাঁহাদের পার্থিব বস্তুর প্রতি কোন আগ্রহ নাই।
(১৩) সাংসারিক চিন্তায় তাঁহারা নিজেদেরকে কখনও ব্যস্ত রাখেন না।

(১৪) তাঁহারা শান্তি প্রাপ্ত এবং তাহারা সর্বদা নীরব প্রেমে ও খেদমতে মশগুল থাকেন।
(১৫) পার্থিব বস্তু সম্বন্ধে তাঁহারা সর্বদা উদাসীন এবং কোন কিছু হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহারা শোকার্ত হন না।
(১৬) সর্বদাই তাঁহারা স্বর্গীয় ভাবে বিভোর এবং আল্লাহ্‌র জ্ঞান আহরণে মশগুল।
(১৭) তাঁহারা সর্বদা নিঃসঙ্গ জীবন পছন্দ করেন এবং এমন পরিবেশ পছন্দ করেন যেখানে সর্বদা আল্লাহ্‌র ধ্যানেই সময় অতিবাহিত করিতে পারেন।
(১৮) তাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তিকে শক্তিশালী করিয়াছেন।
(১৯) কখনও তাঁহারা জনসমাবেশ পছন্দ করেন না, সর্বদাই আল্লাহ্‌র মহব্বতে মাতোয়ারা।
(২০) সব সময়ই তাঁহারা ধর্ম ও সত্য সম্বন্ধে ছিন্তা করেন, সত্যের জন্য জীবন দান করেন এবং কেবল মাত্র সত্যের হেফাজত করেন।
[শ্রীভগবত গীতা অধ্যায়–১৩]

একইভাবে শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ আহ্‌লে বয়াতের গুণাবলী নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

(১) তাহারা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না।
(২) তাহারা সর্বদাই আত্মশুদ্ধির জন্য চেষ্টিত থাকেন।
(৩) তাহারা পার্থিব বিষয়ের জন্য মোটেই আগ্রহশীল নন।
(৪) তাহারা পৃথিবীতে স্বর্গীয় জ্ঞান দান করেন এবং আল্লাহ্‌র আদেশ বলবৎ করেন।
(৫) তাহারা নির্ভীক ও উদার চেতা।
(৬) তাহারা আল্লাহ্‌র নাম জপ করেন এবং সর্ব সাধারণকে ইহা শিক্ষা দেন এবং স্বর্গীয় জ্ঞান দান করেন।
(৭) তাহাদের নফ্‌স তাহাদের অধীনে।
(৮) তাহারা সর্বদাই সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত।
(৯) কাহারো সাথে তাহারা ক্রোধান্বিত হন না এবং কখনও মন্দ বলেন না।
(১০) সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য তাহাদের অমূল্য পোশাক।
(১১) তাহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

(১২) তাহারা কখনও পরচর্চা করেন না এবং অন্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন না।
(১৩) সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাহারা দয়াশীল।
(১৪) তাহারা নির্দয়তার ঊর্ধ্বে।
(১৫) অসহায় লোকের সাহায্যে তাহারা সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন।
(১৬) তাহারা মোটেই স্বার্থবাদী নন।
(১৭) তাহারা কর্কশ ভাষা ব্যবহার করাকে অত্যন্ত পাপ বলিয়া মনে করেন তাই তাহারা সর্বদা মিষ্ট ভাষী।
(১৮) সত্য ও সঠিক ক্ষুদ্র কাজ করিতেও তাহারা লজ্জিত হন না।
(১৯) তাহাদের বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসংগিক, তাহাদের কাজকর্ম সকলেই পছন্দ করেন। অন্যের হৃদয় তাহারা সহজেই জয় করিতে পারেন যেহেতু আত্মতৃপ্তি তাহাদের মূল উদ্দেশ্য।
(২০) প্রকৃতিগত কারণে তাহারা রক্ষণশীল এবং সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
(২১) তাহারা কখনও কোন কঠিন কাজে নিরুৎসাহ হন না অথবা জীবনের উত্থান-পতনে মোটেই বিভ্রান্ত হন না।
(২২) শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে তাহারা পবিত্র।
(২৩) কাহাকেও তাহারা ঘৃণা করেন না।
(২৪) তাহাদের দৃষ্টিতে শত্রুতা অত্যন্ত দোষণীয়। তাহারা একমাত্র প্রেম ভালবাসা শিক্ষা দেন। [ভগবৎ গীতা অধ্যায়-১৬]

বেদ এবং অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থে আহ্‌লে বয়াত

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ধর্ম-গ্রন্থে আহ্‌লে বয়াত সম্বন্ধে লেখা আছে। এমন কি সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হিন্দুদের 'বেদ' তাহাতেও আহ্‌লে বয়াত সম্বন্ধে ব্যক্ত আছে। ঋক, জুর্য্ব, বেদ, অথর্ববেদে রছুল করীম (দঃ) এবং আহ্‌লে বয়াতের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যাই হোক সে বিশদ আলেচনার প্রয়োজন নাই।

মহরমের সময় রাজ সিংহাসন ত্যাগ এবং আহ্‌লে বয়াতের উপর বিশ্বাস

প্রখ্যাত পারস্য ঐতিহাসিক জনৈক হামলাতা এ হায়দরীর মত্ অনুযায়ী ফাতাহ আলী টিপু সুলতান রমজান ও মহররম মাসের মধ্যে কঠোরভাবে সংযম পালন করিতেন এবং

মুক্ত হস্তে দান করিতেন। মোহররমের ১লা হইতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত সহিদে আজম হযরত ইমান হোসেন (আঃ)-এর স্মরণে রাজ সিংহাসনে বসিতেন না এবং এই শোকের ১৩ দিনের মধ্যে তার ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক সমস্ত কাজ ও অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যানেই মগ্ন থাকিতেন এবং গরীবদের জন্য নোঙ্গরখানা খুলিয়া রাখিতেন।

টিপু সুলতানের রাজত্বকালে 'ইমামী' 'হায়দরী' 'জাফরী' ইত্যাদি বহু ইসলামিক নামে মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। উহা অদ্যাবধি কিছু কিছু যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তাহার লাইব্রেরীতে হাজার হাজার হস্ত লিখিত বই আছে যাহার উপরে পাক—পাঞ্জাতনের, আল্লাহ্‌, মোহম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসেন এবং ৪ খলিফার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আছে। [জুলফিকার' মোহররম ১৩৮৯ হিঃ]

বোলাসছালাম নামে জনৈক খৃষ্টান তার অশান্তির সময় বলিতেন, "আমার ঘা" (ক্ষত) অপারেশন হওয়ার পরে আমি একেবারেই নিরুৎসাহ ছিলাম, বৈকালে আমার হাড্ডিতে ভীষণ ব্যথা হইত। আমার ধারণা বহু পূর্বেই আমি মরিয়া যাইতাম কিন্তু প্রকৃতিগত কারণেই আমি বাঁচিয়া গেলাম এবং শান্তি পাইলাম। আমি হযরত বতুল (ফাতেমা জাহের)-এর হযরত ঈমাম হোসেন (আঃ) হইতে সান্ত্বনা পাইলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সঠিক ঔষধ বাতলাইয়া দিলেন। ঐ সমস্ত ব্যক্তিত্ব, যাঁহাদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে যাহারা এক পেয়ালা পানি পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। কারণ বিপদ তাহাদের চারিদিকে। তাহাদের থেকেই আমি সান্ত্বনা পাইলাম। আমি হযরত হোসেনের জখম হইতে সান্ত্বনা ও জীবনের নিরাপত্তা পাইলাম।

[জুলফিকার'—মোহররম, ১৩৮৯ হিঃ]

কাশ্মীরী পণ্ডিতের বিশ্বাস

জনৈক ব্রাহ্মণ জিয়ালাল সপুরী কাশ্মীরে বসবাস করিতেন। তিনি মুসলমানদের মত আসুরা পালন করিতেন ও তাজিয়া মিছিলে যোগদান করিতেন। তাঁহার মাতা হযরত ইমাম হোসেনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং কবি মীর আনিস ও মির্জা দবির কর্তৃক হোসেন অনুস্মণে লিখিত কবিতা মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং নিজ খরচে তাজিয়া বানাইয়া মিছিল বাহির করিতেন। [জুফিকার মোহররম ১৩৮৯ হিঃ]

ইমাম হোসেন (আঃ)-এর প্রতি মহারাজার ভক্তি

গোয়ালিয়রের মহারাজ হারিরাও সিন্ধিয়ার আপন ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু অন্য কোন ধর্মকে তিনি ঘৃণা করিতেন। এই মহারাজার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি মোহর্‌রমের প্রথম ১০দিন নিজের আমোদ-প্রমোদ কাজকর্ম সবকিছু বন্ধ রাখিতেন এবং অন্যান্য মোসলমানদের মত হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া তাজিয়া তৈরী করিতেন এবং পূর্ণ ভাবে মোহর্‌রম অনুষ্ঠানাদি পালন করিতেন। প্রতি বছর এই সময় তিনি গোয়ালিয়রের প্রধান ইমাম বাড়ায় যাইতেন এবং কারবালার হৃদয় বিদারক বয়ান শুনিতেন ও আহাজারী করিতেন। ১০ই মোহর্‌রম তাজিয়া অনুষ্ঠানে খালি পায়ে তাজিয়া বহন করিয়া কিছ দূর মিছিল করিতেন। [জুলফিকার মোহর্‌রম ১৩৮৯ হিঃ]

হোসাইনী ব্রাহ্মণ

খাজা হাসান নিজামী (রঃ)-এর রচনা অভিনব ও তথ্যপূর্ণ। সুতরাং আশা করি পাঠক-বৃন্দ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পড়িবেন।

এ রচনাতে খাজা সাহেব শুধু হোসেনী ব্রাহ্মণের উপর আলোক পাত করেন নাই বরং 'কালকীপুরানের' হুযুর (দঃ)-এর শুভাগমনের ভবিষ্যৎবাণীর উপর আলোকপাত করিয়াছেন, উহা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

'ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অসংখ্য হোসাইনী ব্রাহ্মণ আছে। তাহাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ হিন্দুদের মতই, এক কথায় তাহাদেরকে গোড়া হিন্দু বলা যাইতে পারে কিন্তু ইমাম হোসেন (আঃ)-এর উপর তাহাদের বিশেষ বিশ্বাস আছে। তাহাদের ধারণা যে তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ ইমাম হোসেন (আঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে ছিলেন। তাহারা ইমাম হোসেন (আঃ) কে ভারত ভ্রমণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তিনি সম্মতও হইয়াছিলেন। তাই তিনি শান্তির প্রতীক হিসাবে উবায়েদ উল্লা ইবনে জেয়াদকে বলিয়াছিলেন যেন তাহাকে ভারতের দিকে যাইতে দেওয়া হয় যেহেতু তিনি ভারতের ভালবাসা ও সম্মান পাওয়ার আশা করেন।

কতক হোসেনী ব্রাহ্মণ বলেন যে তাহাদের পূর্ব পুরুষ যুদ্ধ শেষে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং অনেকে বলেন যে তাহারা ইমাম হোসেনের সঙ্গে কারবালায় শহীদ হন।

হোসেনী ব্রাহ্মণদের সমস্ত উক্তি ও চিন্তাধারা অমূলক নয় কারণ শ্রী কৃষ্ণ কারবালার ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, উহা বর্তমানে শ্রীমত ভগবত্-এ আছে। কাল্‌কী পুরানের শেষ অধ্যায়ে (১৮টি পুরানের শেষে) শেষ যুগের অবতার সম্বন্ধে বর্ণনা আছে এবং তাঁহার নাতী সম্বন্ধেও আছে, যাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইবে।

মিরাটে কাল্‌কী পুরানের উর্দু অনুবাদে হোসেনী ব্রাহ্মণদের স্বপক্ষে বহু তথ্য আমি পাইয়াছি। উহাতে লেখা আছে যে শেষ যুগের অবতার সম্বল দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিবেন। হিন্দুদের ধারণা যে সকল দ্বীপ মোরাদাবাদ জিলার একটি গ্রাম। কিন্তু বিখ্যাত ইংরেজ প্রফেসার মিঃ ম্যাক্সমুলার, বেদের ইংরেজী অনুবাদে লিখিয়াছেন যে সম্বল দ্বীপ অর্থাৎ আরব দেশ। কারণ সম্বল অর্থ নরম ও তৈলাক্ত মাটি সুতরাং শেষ অবতারের সম্বল দ্বীপ মোরদাবাদ জেলার সম্বল গ্রাম নয়।

কালকী পুরানে ইহাও লেখা আছে যে শেষ যুগের অবতার ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব হযরত মোহম্মদ (দঃ) সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কুরাইশ বংশ আরবের সমস্ত বংশের তুলনায় সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যেমন ব্রাহ্মণগণ হিন্দু সমাজে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। অতএব এ কারণেই শ্রীকৃষ্ণ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কেই শেষ যুগের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কালকী পুরানে শেষ যুগের অবতারের বাবার নাম বিষ্ণুদাশ বলা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণু অর্থ আল্লাহ্ আর দাশ অর্থ আব্‌দ (গোলাম)। সুতরাং ইহাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে শেষ অবতার হযরত মোহম্মদ (দঃ) কেই ইঙ্গিত করিয়াছে, যেহেতু তাহার পিতার নাম আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা বা গোলাম। শেষ অবতারের মাতার নাম 'ওমাতি' বলিয়া উল্লেখিত আছে। ইহার অর্থ সত্যের বাহক, আল্লাহর মর্জির উপর ধৈর্য্যশীলা। এ ক্ষেত্রে হযরতের মাতার নাম 'আমেনা' অর্থাৎ সতী এবং ধৈর্য্যশীলা [ইহাতে আরো লেখা আছে যে শেষ অবতার পাহাড়ের গুহায় ধ্যান সাধন করিবেন এবং সেখানে 'শারাম' আসিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবে। সে অনুযায়ী হযরত মোহম্মদ (দঃ) নবুয়াত ঘোষণার পূর্বে হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান সাধন করিয়াছিলেন এবং ঐ গুহায়ই হযরত জীব্রাইল (আঃ) আল্লাহর বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তাই নয় পুরানে উক্ত বক্তব্যকে কোরানের প্রথম আয়াতে উহার সমর্থন আছে। যেমন 'পড় আল্লাহর নামে যিনি সৃষ্টি কর্তা—

কালকী পুরানে আরো উল্লেখ আছে যে, শেষ যুগের অবতারকে তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ ও দেশবাসী আনুষঙ্গিক যন্ত্রণা দিবে এবং তিনি বাধ্য হইয়া নিজ জন্মভূমি ছাড়িয়া উত্তর অঞ্চলের পাহাড়ের দিকে চলিয়া যাইবেন। এই ঘটনাই নবী করীম (দঃ)-এর জীবনে ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজন কর্তৃক হয়রানী হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল; তখন তিনি মক্কা ত্যাগ করিয়া উত্তর অঞ্চলে মদিনায় চলিয়া যান এবং সেখানে বসবাস করেন।

ইহাতে আরো উল্লেখ আছে যে, শেষ অবতার তাঁহার কন্যা জামাতা ও নাতীদেরকে অত্যধিক স্নেহ করিবেন। তাঁহার এক নাতী তপ্ত বালুর উপর দিয়া প্রবাহিত নদীর কিনারে শহীদ হইবেন। সেই শহীদের রক্ত হইতে একটি চমৎকার আলো বাহির হইয়া সমস্ত জাহানকে চমকাইয়া দিবে। আমি হোসাইনী ব্রাহ্মণদের বক্তব্যের স্বপক্ষে এই ধরনের বহু তথ্য ঐ সমস্ত হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে পাইয়াছি।

হোসেনী ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, শেষ যুগের অথবা বেদ কালকী অবতার এবং তাঁহার নাতী ইমাম হোসেন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। তাহারা আরো বলেন যে তাহাদের বিশ্বাস, হযরত ইমাম হোসেনের পিতা 'ওম' মূর্তি ছিলেন। অর্থাৎ তিনি 'ওমবলি' অবতার।

স্যার আগা খানের অগণিত হিন্দু ভক্তদের বিশ্বাস যে কূফী নিয়মে 'ইয়া আলী' লেখা সংস্কৃত নিয়মে 'ওম' লেখার সমান অর্থাৎ একই রূপ প্রতীয়মান হয়। তাহারা এক ধরনের লকেট গলায় পরে উহার উপর 'ইয়া আলী' ওম (ওঁ) এর মত লেখা থাকে।

আগাখানের হিন্দু ভক্ত ছাড়াও বোম্বেতে আর একটি সম্প্রদায় আছে যাহারা 'সতপন্থী' নামে পরিচিত। তাহাদের লোক সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ এবং ইহাদের মূল কেন্দ্রস্থল আহম্মদাবাদের নিকটে পিরানা নামক স্থানে। এখানে তাহাদের শ্রেষ্ঠ পীর সৈদয় এমাম উদ্দিন সাহেবের মাজার আছে। এই মাজারে আনুমানিক ৩০০ বৎসরের অধিক যাবৎ একটি বাতি জ্বলিতেছে। ইহার কাছাকাছি আরো একটি মাজার আছে উহার নাম 'জানুই'। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা মমীন হইতে চায় তাহারা ঐ মাজারে গিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলে এবং পরে পীর সাহেবের মাজার জিয়ারত করে। এদের মধ্যে আরো উপদল আছে, 'গুপ্তি' উপদলটি অন্যতম। গুপ্তি অর্থ লুকানো। তাহাদের নাম আকৃতি, প্রকৃতি এবং সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান সবই হিন্দুদের মত। তাহারা গোপনে গোপনে 'আলী' নাম জপ করে, তাহারা পীর ইমাম উদ্দিনের মাজার ও বাতি জিয়ারত করে, তাহারা তাহাদের আয়েরও ১/১০ অংশ ঐ মাজার তহবিলে দান করে; এদের সংখ্যাও প্রায় ১৫ লক্ষ। পরবর্তী উপ সম্প্রদায়ের নাম 'প্রগতি' অর্থাৎ জ্ঞান। তাহারা পূর্ণভাবেই শিয়া সম্প্রদায় এবং তাহাদের খেতাব 'মমীন'। এদের আয়ের ১/১০ অংশ ঐ মসজিদে দান করে, তাহারা রীতি মত রোজা-নামাজ করে; নামগুলিও তাহাদের

ইসলামিক। যেমন, গোলাম আলী, গোলাম হোসেন, গোলাম হায়দর, কুলসুম বাঈ, ফাতেমা বাঈ, রোকেয়া বাঈ, জয়নব বাঈ ইত্যাদি। এদের আর একটি উপ সম্প্রদায়, তাহাদের কেন্দ্রস্থল পালানপুর জিলার পীর মাসায়েমে ইহাদের প্রতিষ্ঠাতা। এরা শিয়া ছুন্নীর সমন্বয়ে গঠিত, এবং ইমাম হোসেন (আঃ)-এর গুণাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

সিন্ধু ও বোম্বাই প্রদেশে আরো দুইটি উপ সম্প্রদায় আছে। উহাদের একদল 'মেরাজ পন্থী' ও অপরটি 'পিরানা পন্থী' হিসাবে পরিচয় দেয়। 'মেরাজ' পন্থীদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'ছাতদ্বীনী' এবং পিরানাপন্থীদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'কুলযুম শরিফ'। কাটিয়া ওয়ারে এ সমস্ত গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ মসনবী শরিফ, দেওয়ানে হাফিজ, কোরান মজিদ ও নবী করিম (দঃ)-এর হাদিসের সমন্বয়ে গুজরাটী ভাষায় হস্ত লিখিত গ্রন্থ।

এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে হযরত মোহম্মদ (দঃ) সশরীরে মেরাজ গিয়াছেন। হযরত ইমাম মেহ্দী (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কে তাহারা দৃঢ় আস্থাশীল। তাহাদের উপাসনা ঘরকে 'ধাম' বলে। সিন্ধু প্রদেশের নগর ঠাট্টায় এবং কাটিয়া ওয়ারের জাম নগরেও এই 'ধাম' আছে। কাটিয়া ওয়ারের রাজকোটের 'ধাম' আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং 'কুলযুম শরীফ'ও দেখিয়াছি।

সমাপ্ত

AwliyaLink, www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com,
E-mail: awliya1214@gmail.com
★★★★★★★★★★★★★★★★